পরিচয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় অগ্রন্থিত

পদ্যলেখকের নিবেদন

স্বভাবতই আমি খুব অগোছালো। এমনকি পদ্যও, যথাযথ, গুছিয়ে রাখতে পারিনি। বেশ কিছু খাতাপত্র তো ট্যাক্সিতে হারিয়েছে। বাড়িতে যা ছিলো তা এককাট্টা করে মীনাক্ষী রেখে দিয়েছিলো। সেই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ কোনো পত্র-পত্রিকাতে ছাপাই হয়নি, গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া তো আরো বড়ো কথা। এখন, সেই পাণ্ডুলিপি মোটামুটি কালানুক্রমিক সাজিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু সমীর একটা বই-এর চেহারায় এনেছে। এই সাজানো খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। সব লেখার শেষে আমার তারিখ দেওয়া ছিলো না। হাতের লেখার ঢঙ, পদ্যের ভিতরকার ব্যবস্থা—এইসব দেখেশুনে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আজ এই 'অগ্রন্থিত'। বইটির মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিছু পঙ্‌ক্তি রয়ে গেলো। আমার ধারণায় দুর্বল কিছু লেখাও আছে। দুর্বলতা থাক। আমার ধারাবাহিক পাঠক এই বই বের হলে কিছু সুবিধা পাবেন বলে আমার মনে হয়।

সম্পাদনা
সমীর সেনগুপ্ত

৬০ টাকা

প্রতিক্ষণ
৭, জহরলাল নেহেরু রোড,
কলকাতা-১৩
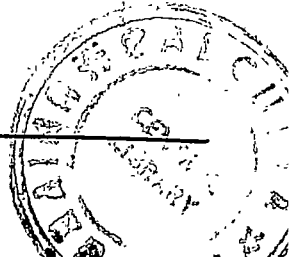
বড়োর ছড়া

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ঃ দশ টাকা

প্রকাশক ঃ স্টেট রিসোর্স সেণ্টার (পশ্চিমবঙ্গ)
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১।৬, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

'বড়োর ছড়া' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি অভিনব ছড়ার বই। বয়স্ক সদ্যোসাক্ষরদের জন্য তিনি এই বইটি লিখেছেন। সদ্যোসাক্ষরদের জন্য সাহিত্য রচনায় বিশিষ্ট লেখকদের উৎসাহিত করার প্রয়োজনে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে নন্দন-এ আমরা একটি আলোচনা সভা করেছিলাম। তারপর সকলের আগে মাত্র একদিনের মধ্যে ষোলটি ছড়া লিখে দিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বইটির নামকরণ তিনিই করেছিলেন। তাঁর পছন্দমতো বইটিতে ষোলটি ছবি এঁকে দিয়েছেন চিত্রশিল্পী অনুপ রায়। এটিই তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই। তিনি নবসাক্ষরদের জন্য রচনার কাজে আরো বেশি করে অংশ নেবার ইচ্ছা কিছুদিন আগেই প্রকাশ করেছিলেন।

আশীর্বাদ

শ্রীমান কিশোরকান্ত

নবীন অভ্যাগত,
নব-যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক :
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি।
জীবন-রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামতরে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয় তো রচিবে মিলনতীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারা সম নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো এই বুঝি দিল আনি॥

৩০/৭/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমৃতকলা দেবীর দৌহিত্র ও রমা-উমানন্দের সহিত ॥

পরিচয়

এপ্রিল ১৯৯৫ বৈশাখ ১৪০২ ৬৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা

প্রবন্ধ

পারিবারিক রচনা

শোকলিপি

প্রচ্ছদ ঃ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়-র বদলে

বুকের গ্রহণ-লাগা চাঁদ

তোমার মুখের অংশ লেগে আছে গ্রহণের চাঁদে।
ধলভূমগড়ের পাথরে
সূর্যাস্ত দেখেছে রক্ত, কার রক্ত ?
কালজানি নদীর শিয়রে
মুন্ডারি বালিকা বলে ঃ একদিন এখানেও ছিল,
ছিল নাকি ?—হেসে ওঠে পাঞ্চেতের ভারী ডার্জ,
ইকো দেয় বেথুয়াডহরি,
এ-সব কথাকে ঠোনা মেরে
নীচের পৃথিবী থেকে উপরের পৃথিবীতে উড়ে
তোমার মুখের মাংস সেঁটে আছে গ্রহণের চাঁদে।

প্রতারক হাতছানি শেষে
কমলাপুলিতে গিয়ে দেখি
শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে ভোরবেলা পাঁচটা পঁয়ত্রিশে।
আমিও জিগজ্যাগ ছুটে অলৌকিক জেটে চেপে
নাগাইসারি-কে ছুঁয়ে নেমে পড়ি সামসিং পাহাড়ে
যেখানে ছেড়েছে ঝর্ণা লাল মাছ আর খোলা চুল.
সে উপত্যকায় বাষ্প-স্নান শেষে
চলে আসি ভুটান বর্ডার,
সেখানে নিরাশ হয়ে
হলদিবাড়ি রোড বেয়ে খরস্রোতা তিস্তার মতন
ক্রমাগত ছুটি আর নামি,
তোমাকে পেতেই হবে—
মাথার টবের মধ্যে কে পুঁতেছে এত পাগলামি ?

মৃত্যু তো নেয় না কোনো দান,
এখন তোমার কোনো নেগেটিভ নেই,
প্রাকৃত কুঠার দিয়ে আশাতীত নিপুণতা দিয়ে
তোমার শরীর থেকে কেটে নেওয়া হয়ে গেছে ছায়া,
তবু তুমি কি বাজাও আসঙ্গের কোষে কোষে
শিরার টানেল বেয়ে তীব্র সাইরেন,
বাজে-ঝড়ে-বিস্ফোরণে
চন্ড ব্লিজার্ডের ক্রোধে
হাঁকো—আছি, সবখানে আছি,
শমী-র গহনে অগ্নি
মাংসের ভিতরে কীট
আত্মার নিহিতে কানামাছি
যেরকম বসে থাকে
গোপন সন্ত্রাসে প্রতিবাদে।

প্রধান মায়াবী তুমি, এতো পারো
তবু কেন কিছুতেই লুকোতে পারো না
তোমার অন্তিম অশ্রু বাষ্প হয়ে মিশে আছে
বুকের গ্রহণ-লাগা চাঁদে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পরিচয় থেকে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা

১৯৬৮-১৯৯৪

পিছনে জল অথৈ আর সামনে আছে জ্বালা

পিছনে জল [illegible] আর সামনে আছে জ্বালা
দূরদেশের শিশুর কান বোমায় করে কালা
চোখের কাছে আঁধার—প্রাণ বাঁধার মন বাঁধার
কাজ কি শেষ এই দেশে ?

চল না যাই ভিয়েতনাম সকল গ্রাম ভরিয়ে দিই
চল না যাই সেখানে প্রাণ শতেকখান ছড়িয়ে দিই সেই দেশে !

আমরা মাটি বৃথাই চাটি—শান্তি আর
সংযমের কথাও কই চমৎকার
—দুয়ারে দিই খিল যখন ডাকাত ছেঁচে বিল
তখন রায়বেঁশে
নাচ দেখাই ভড়কি বুকে সড়কি গেঁথে আছড়ে পড়ি এই দেশে !

—পিছনে জল অথৈ আর সামনে আছে জ্বালা
দূরদেশের শিশুর কান বোমায় করে কালা
চোখের কাছে আঁধার—প্রাণ বাঁধার মন বাঁধার
কাজ কি শেষ এই দেশে ?

শারদীয় ১৯৬৮

নদীতে কিছু পাথর

পাথর কিছু পাথর থাকা ভালো
নদীতে কিছু পাথর থাকা ভালো।
তাহলে, যদি ফেনার ফুল ফোটে
গানের মতো শ্বাপদ ভেসে ওঠে—
পাথর কিছু পাথর থাকা ভালো
নদীতে কিছু পাথর থাকা ভালো।

পুকুর ভারি প্রয়োজনীয় স্নানে,
শীতল থাকে ছায়ার-অবদানে—
শ্যাওলা-দাম মজায় তার কোণা
তলায় শোয় পাঁকের কালোসোনা ;
বাতাস তাকে পরায় ডুরে শাড়ি—
এমন রূপ ! ভালো না বেসে পারি ?

এরা তো এই দুজন, বলো কাকে—
জড়াব ক্ষুৎকাতর সাতপাকে ?

শারদীয় ১৯৭৮

তোমার কেমন লাগে ?

তোমার কেমন লাগে চাঁদ ?
জঙ্গলের অন্তর্গত ফাঁদ—
কী লাগে, কেমন করে লাগে
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ ?

চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া
যদি পাও, সেই ফিরে পাওয়া
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ—
চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া ?

জানুয়ারি ১৯৭৯

তুমি আছো, সেইভাবে আছো

ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু, দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে···
বিচারসাপেক্ষ এই জনে-জনে বেঁটে দেওয়া থেকে
এবার নিষ্কৃতি নেবে, ভালোবাসা ভেবেছিলো এই
কিন্তু, তুমি ছুটি নিয়ে গেলে···
স্মৃতির স্থগিত রূপ রেখে গেলে চোখের সম্মুখে
বুকের ভিতরে রেখে গেলে নিষ্ঠাবান মাতৃমুখ
করস্পর্শ রেখে গেলে শোকদুঃখ থেকে তুলে নিতে
বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।

পিছনে দেবদারু গাছ, তার শান্ত ছায়ার বিকেলে
প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই খেনে, উর্ধ্বগামী সিঁড়ি
বরফ খণ্ডের রোদ বারান্দার এখানে-সেখানে
পড়ে আছে, তুমি নেই ··
কোনদিন ছিলে না এমন, ছিলে নাকি ?
স্বভাব ছিলো না কিছু আগে আসা, সময়ের আগে ?
সময়ের বেশ কিছু আগে এসেছিলে বলে আফসোস করোনি
এতো স্বাভাবিকভাবে তুমি সব মেনে নিয়েছিলে
আমরা পারিনি, তাই, মাঝেমধ্যে বেঁকেচুরে গেছি···

সাদর আঙুল তুলে তুমি সাবধান করে দিতে, মনে আছে ?
তোমার মন তো ভালো, কারো মন্দ কখনো দ্যাখোনি
নিজেকে বিপন্ন করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছো
দীর্ঘ ও সহাস্য হাত অসুখের রেখেছো কপালে
কতোবার, আরোগ্যের মধ্যে ছিলো তোমার করুণা।
করুণাই বলি একে, বিশ্বাসভাজন ভালোবাসা
কিংবা, তারও চেয়ে কিছু বেশি এই নিষ্পলক আলো
অন্ধকার গলি থেকে বহুবার সড়কে এনেছে আমাদের।

বন্ধু, সুখে থেকো আর মনে রেখো দেবদারুছায়ে
কিছু কিছু লতাগুল্ম, ছোট গাছপালা—আর কথা
তোমার মন তো ভালো, মনে রেখো, পরিত্রাণ করো
প্রকৃত সংকট থেকে, ভালোবাসাহীনতার থেকে
ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারিনি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছো
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে কাছাকাছি।

— দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯

এক টুকরো মাংস

এক টুকরো মাংসে পড়ে বেড়ালের থাবা।
নখ বেঁধে, রক্ত পড়ে সেই মাংস থেকে ;
অথচ, জীবনী থেকে সে বিচ্ছিন্ন আছে—
যেভাবে, সংসারে থেকে সন্ন্যাসীর গায়ে
অবিষয়ী আঁচ লাগে, এ মাংস তেমনই,
যখন সংলগ্ন ছিলো, রক্তই ছিলো না।
এই হয়, বোধকার, তেজস্বীর কাছে
পাহাড় লোফার কষ্ট একদিন ছিলো না।
লুফে-লুফে লুফে-লুফে শিক্ষকতা পেলে—
আর শিক্ষকতা নয়—বোধ কাজ করে।
কাজ করে বটে, কিন্তু, বিবেচনা কর ঃ
ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে দিলে পড়াবো নিশ্চয়।
আনকোরা গ্রন্থ নয়, ছেঁড়া পাতা পেলে—
মনোযোগ দিয়ে পড়ে ভালো মন্দ ছেলে !

শারদীয় ১৯৭৯

ভালো থেকো

বহুযুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে শান্তিনিকেতনে
আসা, ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ উধাও খোয়াই
এখনো বুকের কোনো গভীর প্রত্যন্তে দেয় টান
রক্তপাত হওয়া ছিল অনেক সহজ।

তার বদলে

যন্ত্রণাকাতর হয় চক্ষুদুটি, মাকড়শার জাল
পাতায় পাতায় বাঁধে, দমকা বাতাসে ছিঁড়ে যেতে।
অভ্যাস এমনই, ভেবে কষ্ট পাওয়া, স্বচ্ছ সুখ নয়…
নিশ্চিত নিভৃত দুঃখে ভেসে যাওয়া, নিরুদ্দেশ ভাসা
গোয়ালপাড়ার দিকে…

মনে পড়ে এখনো ঊর্মিলা ?

মন কি এখনো আছে ছাই মাজা বাসনের মতো গভীর উজ্জ্বল ?
পিতল-বাসনে, জানো, কলঙ্কের নীল
তেঁতুলের ছোঁয়া ছাড়া নিষ্ক্রান্ত হবে না।
সমস্ত পুরনো কথা, জানা কথা—পুনরুক্তি তবু,
মাঝেমাঝে করে ফেলি—যদি ভুলে যাও !
মনীষাও ভুল করে, আমরা দুষি একাকী নির্বোধে !

থাক কূটকচাল আর মনে পড়াপড়ি !
পশ্চাদ্‌ভ্রমণে থাকে ঝুল-মাখা ঘরের বিলাস,
এবারের এলোমেলো থেকে ভাবছি দেব উপহার
কিছু কথা, অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা ক্যানালের জল ভালো হবে ?

কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না
বিকেলে গা ধুয়ে এসে তুলে দেয় রুদ্ধ নিমন্ত্রণ
জঙ্গলের নীলাঞ্জনা…
সে যে কি রক্তের যুদ্ধ ! তার উপর সূর্যের সিঁদুরে
ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

বিশ্বাসের অলিগলি উঠোন আঙিনা
দুহাতে দখল নেয় স্বপ্ন, অবিশ্বাস—
অমোঘ আমিষ গন্ধ ছড়ায় বাতাসে
কষ্ট হয়।
কষ্টের প্রকৃত শিক্ষা এখনো হলো না।
বিনি নিমন্ত্রণে আসে, কালের ইঙ্গিতে চলে যায়।

সে যাহোক, ভালো আছো ?
বিবাহের পরে কিছু মুটিয়েছ বরের সংসারে ?
বাতাসের হাতে ঝিলে জল-বুলি ছিল এক ঢাল
কোঁকড়া চুল, তাকে রাঙা ক'রে
জঙ্গলমহাল রাঢ় করে তুলেছ কি ?
ইচ্ছে হয় দেখে আসি আমি অন্তত একবার, একঝলক !
তারপর মনে হয়, বৃষ্টি হবে, সব ধুয়ে যাবে
সর্বনাশা ছবি ভেঙে উঠে আসবে শান্ত পরিস্থিতি—
সোনার সংসার, সুখ, ঘরবর, সার্কাস, সিনেমা !
কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না।
পুড়িয়ে পাখির মতো টুকরো টুকরো করে হবে সান্ধ্য বনভোজন।
কোনোদিন মনে হয়।
যা হয় তা হোক
কিন্তু, তুমি ভালো থেকো
তুমি ভালো থেকো ॥

শারদীয় ১৯৮১

আমি এই সংকল্প নিয়েছি

জ্বরের কম্বল থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলি আঁশ,
যেন জ্বর বসন্তের গুটি
শুকনো হয়ে ওঠা চামকুটি।
বাতাসে ছড়াই কিছু মানুষকে আক্রান্ত করবো ব'লে।

রোগে পঙ্গু করে তুলবো, আমি এই সংকল্প নিয়েছি।
শেষ করে দেবো এই বুকে হেঁটে বাঁচার লালসা,
ইঁদুরের মত এই নিচু হয়ে বাঁচার লালসা।

লাটাই-ঘুড়ির যোগাযোগকারী সুতোও ছিঁড়েছি
জীবনে অসংখ্যবার, তারপর উড়ে গেছে ঘুড়ি।
বটের শাখায় শ্লেষ্মা জড়িয়ে ধরেছে মুখপুড়ি···

এককোণা ফাটা, দুই ঝাঁটা মারি ওড়ার লালচে,
কোনোমতে থাকা, শুধু টিঁকে থাকা অসহ্য আমার।
শুধু নয়, দুদু চাই, মুরগমসল্লা এক হাঁড়ি—
সুখ ও সমগ্রভুক্ আমি। হব বামুনের রাঁড়ি!

শারদীয় ১৯৮২

ছুঁয়ে যাচ্ছে

ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা—শিরিষ পাতায়।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে—
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায় ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে!
আকাশ ভরে আছে মেঘে
পাতার ভিতর বাতাস স্নেহে
বয়ে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে, পরিহাস্যে
তার আমায় তো কথাই ছিলো
পরিবেশেই প্রকাশিলো, অনৌদাস্যে—
ছোঁয়ার পরম অর্থ আছে
হোক না ছোঁয়া শিরিষ গাছের
সরল ভাষ্যে
বোঝার যা সব বুঝেই নিলো
তার আসার তো কথাই ছিলো
এসেছে সে।
ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা—শিরিষ পাতায়।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে,
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায়, ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে।

শারদীয় ১৯৮৩

সুন্দর যেখানে

সুন্দর যেখানে থাকে, চিরকাল সেখানেই থাকে
স্থির ; শুধু মানুষেরা, শুধুমাত্র সৌন্দর্যপ্রেমীরা
ঘুরে-ঘুরে কাছে যায়, তার কাছে, সুন্দরের কাছে
একাকী, গোষ্ঠিতে নয়, গোষ্ঠিচক্ষু সুন্দর দ্যাখে না
সে কেবল দ্যাখে রূপ, তৃণভূমি, প্রগাঢ় পাথর,
রূপ, ঐ সুন্দরের কাছাকাছি আরেকটি অন্বয়—
সুন্দর যেখানে থাকে, চিরকাল সেখানে রয়েছে।

জুন-জুলাই ১৯৯১

ভালোবাসা সব জানে

যাবার সময় হলো, তাই এ-উচ্চণ্ড ভালোবাসা—
ভালোবাসা ঘরে-বাইরে, ভালোবাসা দ্বিধাহীন জ্বর।
ভালোবাসা থেকে আসে রমণী-কিশোরী পরস্পর,
চুম্বনে কী মর্মতল তৃপ্ত করে আশা—
ভালোবাসা সব জানে, গোপনে আকণ্ঠ ভালোবাসা।
শুয়ে-বসে ভালোবাসা, ভালোবাসা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে,
পুরাতন হাসি সেকি নূতন নূতনতর হয়?
স্পর্শময় ভালোবাসা দেহে লেগে থাকে সর্বক্ষণ,
নিষ্পাপ কিশোরী কীসে তীরবিদ্ধ—
ভালোবাসা সব জানে, ভালোবাসা অক্ষত-মোহন।

শারদীয় ১৯৯২

দেওয়া-নেওয়া

দেবার যা ছিলো, দিয়েছো পুষিয়ে,
তুমি, মালবিকা, অন্তরগ্রীবা বাড়িয়ে দিয়েছো।
যখন চেয়েছে পাখির মতন সেই গ্রীবা খুঁটে কি যেন খেয়েছে!
চেয়েছে বলেই পেয়েছে দুগুণ, না গুণে দিয়েছো;
দেবার ছিলো যা দিয়েছো পুষিয়ে—
একে একে বহু বহুতর ক'রে,
দেবার যা ছিলো দিয়েছো পুষিয়ে,
নেবার যা ছিলো, কিছুই নাওনি দুই হাত পেতে।

শারদীয় ১৯৯৩

মানুষ তুমি একটি জীবন

পথ দেখানো সোজা, কিন্তু পথটি ভোলাই কঠিন,
মানুষ তুমি একটি জীবন তেমন কাজ করে বেড়ালে!
ভালোই ছিলো মাটির জীবন, ভালোই ছিলো কালো,
মানুষ তুমি বদল চেয়ে সেই কথাটি মনে রাখোনি।

তুমি ভীষণ আলাভোলা, তুমি-ভীষণ, ভয়ংকরী,
তুমি মানুষ বদলে হলে পাথর, পথে পড়ে রইল—
তুমি নদীর ভিতর গেলে, নাইতে নেমে কই ভেজালে
শরীর তোমার, পোড়া শরীর? এখন নাওয়া ঠিক হলো কি?

শারদীয় ১৯৯৪

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চিত্রকল্প

বিজন চৌধুরী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আমি এক প্রবীণ পাঠক। দীর্ঘ ৩৫ বছর তাঁর রচনার সঙ্গে বন্ধুত্বে জড়িত। শক্তির উপলব্ধ প্রকাশ-বৈশিষ্ট আমাকে আকৃষ্ট করে। তাঁর ভাষার স্বেচ্ছা বিচরণ, সুরেলা ভঙ্গী, জীবনের পরিপ্রেক্ষিতকে মায়াময় উপস্থাপনের ক্ষমতা ভীষণ ভাবে আকর্ষণীয়।

শক্তির কবিতায় প্রবেশিত চিত্রকল্প আমাকে অনেক সময় বিস্মিত করেছে। একথা স্বীকার্য যে বিষয়, ভাষা, ছন্দ এবং চিত্রকল্প নিয়ে শক্তি কোনদিন কোন সাজান বাগান রচনা করতে চায়নি। এ কারণেই বাস্তবতা বিমূর্ত হয়েছে। দৃশ্যেজগৎ চাক্ষুষ সত্যের বাইরে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতীকী রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার লক্ষ্য করলে এটাও দেখা যায় যে, দৃশ্যের খণ্ড খণ্ড বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে কোলাজধর্মী চিত্ররূপের যে স্বতন্ত্রতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৫৯ সালে, কলেজ স্কোয়ারে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের মাধ্যমে। প্রকাশ ও শক্তি এসেছিল আমাদের এক যৌথ চিত্রশিল্প প্রদর্শনীতে যাবে বলে। উল্লেখিত প্রদর্শনীটির স্থান ছিল আর্ট ইণ্ডাস্ট্রির পার্ক ষ্ট্রটের প্রদর্শনী কক্ষে। শক্তি এ প্রদর্শনীতে সেদিন দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিল। আমাদের সাথে আড্ডা দিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। আমাদের, এবং আমাদের ছবির সে সঙ্গ দিয়েছে। দু একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, প্রাসঙ্গিক মনে করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে প্রথম পরিচয়ের সময়কালেই মার্কিন 'বীট' কবি অ্যালান গিন্সবার্গ কলকতায় আসেন। কবি গিন্সবার্গ ছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর, বিশেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধুস্থানীয়। আমাদের এক যৌথ প্রদর্শনী তখন আর্ট ইণ্ডাট্রির প্রদর্শনী কক্ষে চলছে। ঐ প্রদর্শনীতে সদলে গিন্সবার্গ—সহ শক্তি উপস্থিত হয়ে ছবি নিয়ে প্রথমে আলোচনা, পরবর্তী সময়ে তর্ক-বিতর্ক ও হাতাহাতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ঐ ঘটনার প্রচণ্ডতা নিয়ে শহরে তখন অনেক গল্পকথা রটেছে। অবশ্য এসবের অন্যান্য দিকও ছিল।

শক্তিরা তখন ভীষণ ভাবে বিদ্রোহী। সমস্ত কিছুকে নস্যাৎ করতে চাইছে, ভাঙতে চাইছে। এরা তখন আভাঁগার্দ, হাংরি-ক্ষুধার্ত, 'অ্যাংরি' শিল্প-দর্শনের অনুরাগী।

যাই হোক এসব নিয়েই শক্তি নিয়মিত চিত্র-শিল্পীদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিল। কয়েকজনের বন্ধু হয়েছিল।

আর একটি ঘটনাও শক্তির শিল্পকলার প্রতি আসক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। ১৯৬৩ সাল, কলকাতা কর্পোরেশন অফিসের দক্ষিণ দিকের পার্কে এক চিত্রকলা-ভাস্কর্যের মুক্তমেলা বসেছে। এ মেলায় অনেকে যেমন ছবি, মূর্তি সাজিয়ে বসেছিলেন, সমসাময়িক কবিরা কবিতা পাঠও করেছেন প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায়। উল্লেখ্য যে প্রকাশ কর্মকার যেখানে ছবি টাঙিয়ে ছিলেন সেখানে এক লিখিত বড় অক্ষরের ব্যানার ছিল, 'ছবি কিনুন, ছবির সাথে সহবাস করুন।' আমরা তখন অনেক শিল্পীরা ছবির প্রচার ও প্রসারের পক্ষে সোচ্চার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েই প্রকাশের কাছে সহাস্যে প্রস্তাব রাখে, দাবী জানায়, আমি অবশ্যই কবিতা পড়ব, কিন্তু সহবাসের জন্য একটি ছবি চাই। আমার একক প্রদর্শনীতে এবং বাড়ির স্টুডিওতে তার অনেক আগমন ঘটেছে। ছবি দেখেছে—আলোচনায় মেতেছে।

শক্তি ছবি দেখতে ভালবাসত, আধুনিক মননে ছবির রসাস্বাদনে প্রচেষ্ট ছিল। আমার ধারনায় ছবির ভাষা, চিত্ররূপ হয়ত তার কল্পনার বিস্তারের সহায়ক হয়েছে। প্রত্যক্ষ না হলেও বর্ণময় এক স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রকল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

শক্তির অনেক কবিতার কিছু অংশত বাঁধানো ছবি। এক্ষেত্রে শক্তির প্রকৃতিকে দেখার, তার সাথে আত্মীয়তার দিকটিও উপেক্ষনীয় নয়। প্রকরণগত তফাৎ ছাড়া একজন চিত্রকরের মতনই গ্রহণে বর্জনে সে প্রকৃতির চিত্ররূপ এঁকেছে ভাষার মাধ্যমে।

২

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু নির্বাচিত কবিতার চিত্রকল্প নিয়ে আমার কিছু ভাবনা উপস্থিত করছি—

প্রথম কবিতা—'হলুদবাড়ি'

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত-গড়েছে মিস্তিরি।

কবিতার এ অংশটুকু'ত রোমান্টিক বাস্তবতা নিয়ে একটি ফ্রেমবন্ধ ছবিকেই মনে ধরিয়ে দেয়। অন্য অংশে মরক, মৃত্যুচেতনা সিঁড়ি বদলের যে বিস্তার, তারই যেন একটি আলাপন-প্রেক্ষাপট।

দ্বিতীয় কবিতা—'মনে পড়লো'

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন?

জংশন, ট্রেন, লেভেল-ক্রশিং, কবিতা-পাঠরতা মহিলা। এখানে ত ক্যানভাসের একটি ছবির বিষয় হয়ে চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে। ছবিতে একটি স্থির মুহূর্তকে ধরতে চাওয়া যা, ইম্প্রেশনিস্ট ঘরানার ছবিকে স্মরণ করায়।

তৃতীয় কবিতা—'অবনী বাড়ি আছো'

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরান্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো?'

বন্ধ দুয়ার, সবুজ নালিঘাস, গাভীর মত চলমান মেঘ, বৃষ্টির বর্ণনা-ও এক প্রতীকী ছবির সম্ভাবনাকেই অনুভবে আনে।

এছাড়া সমভাবেই প্রতীকী অবস্থানে পাই নিচের 'আমি স্বেচ্ছাচারী' কবিতার চিত্রকল্প অংশেও।

'তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিল বাড়ি?
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী'

পঞ্চম কবিতা—'সরোজিনী বুঝেছিল'

দুপুরে আঁধার ঘর—মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় সাদা রাজহাঁস

ষষ্ঠ কবিতা'—'জুলেখা ডবসন'

ছিলো অনেক রাজার বাড়ি চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হ্রদ সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডবসন।

উপরের দুটো কবিতার চিত্রকল্প ব্যক্তি অনুভূতির বিশিষ্টতায় এক নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে। দুটো কবিতার চিত্রকল্পই খুব ঐতিহ্যবাহী এবং রোমান্টিক। সাদা হাঁস, রমনী, পরের কবিতায় রাজার বাড়ি, চকমিলানো হাজার গাড়ি এসব যে কোন শিল্পীরই প্রেরণার স্থল হতে পারে।

'ছায়ামারীচের বনে' কবিতার এক অংশে—

হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও
যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে দূরে
আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালো জল—
হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

এবং 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে'—কবিতায় 'দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত······চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মত মনে হয়' এবং 'জরাসন্ধ' কবিতায়······'যে মুখ অন্ধকারের মত শীতল, চোখ দুটি রিক্ত হ্রদের মত কৃপণ,······'

উপরের পর পর তিনটি আলোচিত কবিতার চিত্রকল্পে কবির সংবেদনের বিভিন্ন প্রতিরূপ উপস্থিত হয়েছে। 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতায় কল্পনায় মরুঅঞ্চল ভেসে ওঠে। উট, কুয়োতলা, কাঁটগাছকে উপস্থিত করে যেন কোন রাজস্থানী ঘরানার অনুচিত্রকে সামনে দাঁড় করায়। আবার 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে' এবং 'জরাসন্ধ' কবিতার অন্ধকার শীতল মুখ হ্রদের মতন কৃপণ রিক্ত চোখ এই দুটি কবিতারই চিত্রকল্প খুবই প্রতীকী চিত্ররূপে উদ্ভাসিত হয়।

আরো অনেক কবিতার নিশ্চয়ই উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘ হয়ে যাতে না যায় তার জন্য কয়েকটি বেছে নিয়েছি। এছাড়া এমন অনেক কবিতার চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যায় যেখানে বাস্তবতা কবির ভাষায় নিজেকে নিজের মতো করে দেখার জলজ দর্পণ। পরিশেষে বলতে চাই কবিতা ছবি নয়। কিন্তু কবিতার চিত্রকল্প হয়ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শক্তির মিছিল

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

শক্তি যখন শেষবারের মতো চলে আসছিল শান্তিনিকেতন থেকে, বরফে শান্ত ক'রে রেল বগির মেঝের ওপর শুইয়ে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছিল কলকাতায়, তখন যাত্রীদের অনেকেই নাকি তাকে নিয়ে আলোচনা করছিল, কেউ কেউ নানারকম মন্তব্যও করছিল। এমন ঘটাই স্বাভাবিক না ঘটাই আশ্চর্য। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে শেষবার ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর বিগত সাড়ে পাঁচ দশকে বোলপুর স্টেশন এমন দৃশ্য আর তো দেখে নি কখনও। তরুণীর দল কাঁদছে, যুবকদের চোখ লাল, শান্তিদেব ঘোষ দাঁড়িয়ে আছেন মুখ নীচু করে—তাঁর বুকের ভেতর রবীন্দ্রনাথের কতো গান বয়ে চলেছে অশ্রুনদী ছুঁয়ে ছুঁয়ে, নীরবে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে শক্তির যাত্রার তদারক করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক, কর্মী, ছাত্রছাত্রী, এমন কি বেশ কিছু পদস্থ অফিসারসহ পুলিশরাও দাঁড়িয়ে আছেন শক্তিকে বিদায় জানাতে। কারা যেন এক কোণে দাঁড়িয়ে কী একটা গান গাইছে নীচু গলায়। এমন বিরল দৃশ্য দেখার লোভ কে পারে সংবরণ করতে? তাই বিপুল ভিড় শক্তির কম্পার্টমেণ্ট ঘিরে। সেই ভিড়ে নানা জনের মনে নানা কৌতূহল, নানা প্রশ্ন। সেসব প্রশ্ন যারা করে জবাবও দেয় তারাই। তারাই মন্তব্য করে নানারকম। কে নাকি জানতে চেয়েছিল ভিড়ের কাছে, ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়েই, লোকটি কে বটে? (দৃশ্যটি কি শক্তির দেখা হয়ে গিয়েছিল আগেই? প্রশ্নটিও শোনা ছিল? নইলে কী ক'রে সে লিখেছিল কতোদিন আগে "তীরে কি প্রচণ্ড কলরব। জলে ভেসে যায় কার শব / কোথা ছিল বাড়ি?")

ভিড়ের ভেতর খানিকটা গুঞ্জনের পর একজনের গলায় নাকি শোনা গিয়েছিল, লোকটা কবি ছিল, মদও খেতো খুব, অনেকটা মাইকেলের মতন।

এসব সত্যি কিনা কে জানে! হতেই পারে সত্যি, আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু কথা তো ওঠেই। কতো কথাই তো উঠেছে। শক্তির সহযাত্রী, সঙ্গী কবিরা, বন্ধুকুল, সমালোচকদের অনেকে কথা তো কম তোলেন নি শক্তি থাকতে এবং চলে যাওয়ার পর।

শক্তি কি মাতাল ছিল? নিতান্তই মাতাল? কবি ছিল শক্তি। কিন্তু কতো

বড় কবি ছিল সে? শক্তি মানুষ ছিল। কেমন মানুষ ছিল সে? মাপটা কেমন ছিল সে মানুষের? শক্তি কি কমিউনিস্ট ছিল? মিছিলে হাঁটত কি সে? কেমন মিছিল ছিল তার?

শক্তির সঙ্গী-পায়ীগণ ইতিমধ্যেই অনেক লিখেছেন তার মদ্যপান বিষয়ে। যে সব লেখা বস্তুত পক্ষে তাঁদেরই পানের স্মৃতিচারণ। এবং যেহেতু শক্তিরই সঙ্গে মদ্যপান তাই সে পান ও তার স্মৃতি দুই-ই যেন একটু আলাদা জাতের হয়ে উঠতে চায়, যেন কবি-কবি আভিজাত্য দাবী করে। অথচ অধিকাংশ লেখাতেই মদ্যপানের সঙ্গে শক্তির 'পদ্য' লেখার প্রসঙ্গ বা বৃত্তান্ত আসে না বললেই চলে। যদিও শক্তি নিজেই জানিয়েছে, কুণ্ঠাহীন, মদ্য তাকে নাকি নিয়ে যেতো পদ্যের কাছে। সুতরাং একথা তো নিশ্চিতই ভাবা যায়, মদ্যে আসক্তি তার প্রথম প্যাশন ছিল না। অন্ততঃ পদ্যের মতো প্রবল ছিল না কখনোই। লক্ষ্য তো ছিল কবিতাই। এবং কবি তো ছিলই সে। না, কবিই ছিল সে। নেরুদা, লোরকা কিংবা এলুয়ারের প্রসঙ্গে কারো কি মনে পড়ে তাঁদের মদ্যপানের প্রতিযোগিতা বা নানা কান্ড কারখানার কথা? নাকি ঝলমল করে ওঠে হীরের দ্যুতির মতো কিছু শব্দ, কিছু ভাবনা, কিছু সুখ, কিছু অসুখ, কিছু স্বপ্ন? কিংবা আমাদের ঘরের মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে? তাঁর অসামান্য গদ্যরচনা-গুলি ছাড়া আর কিছুই কি মনে আসে? কমলকুমার মজুমদার নামটা শুনলেই কী মনে পড়ে? নিম অন্নপূর্ণা বা অন্তর্জলি যাত্রা, নাকি খালাসিটোলার ছবি? কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবিতাতেই অস্তিত্ব শক্তির এবং তার অস্তিত্বই কবিতাময়। তার শেষ প্রেমও কবিতাই। আর সব এহো বাহ্য।

কিন্তু এমন কবিতাময় যার জীবন সে আসলে কতো বড় কবি? মানুষ হিসাবেই বা কী মাপ তার?

কবি হিসাবে তার স্থান নির্ধারিত হবে ঠিক সময়ে। নির্ধারণ করার মালিক একা মহাকাল, যাঁর কৃপায় অনেক 'তুচ্ছ' লেখক সময়ে মহান হয়ে উঠেছেন, আবার সমসময়ের বহু "জনপ্রিয়" এবং / অথবা "মহান" লেখকের স্থান হয়েছে ইতিহাসের মুখ-বাঁধা বস্তায়। আমরা শুধু বলতে পারি, আমাদের সময়ের, আমাদের চোখে দেখা শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন শক্তি। সে আমাদের হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করেছে। সে আমাদের আমোদিত, বিষণ্ণ এবং আন্দোলিত করেছে অনায়াসে প্রায় হেলায়-ফেলায়ই যেন।

আর মানুষ হিসাবে, নানা স্তর, শ্রেণী ও কবির মানুষের বন্ধু হিসাবে, সে

যে খুব বড় মাপের ছিল তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তার খেলার বেলা সাঙ্গ হতেই বোঝাই তো গেল কারা ছিল তার খেলার সাথী। নন্দন-এর সভায় শঙ্খ ঘোষ তাঁর স্মরণলিপিতে কবিতার মতো করেই লিখলেন এবং পড়লেন, "এত ভালোবাসা পান নি কেউ, শক্তি যেমন পেয়েছিলেন, এত ভালো বাসেন নি কেউ, শক্তি যেমন বেসেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন তিনি মানুষকে, মানুষের ঘর-গেরস্থালিকে···" এমন নম্র কণ্ঠে এমন অমোঘ সত্য শঙ্খ ঘোষ ছাড়া আর কে-ই বা উচ্চারণ করতে পারতেন? এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের নাম উচ্চারিতও হতে পারে না।

আমাদের চারপাশের বাতাসে অনেকদিন ধরে একটা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে, ভালো মানুষ হতে গেলে মানুষকে প্রতিবাদী হতে হয়। কথাটির কিছু সারবত্তা অবশ্যই আছে। একথার পাশাপাশি সহজ-সরল চেহারার একটা গুজবও ভেসে বেড়াচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে। প্রতিবাদী হতে হলে, সত্যিকারের প্রতিবাদী এবং সেই সুবাদেই সত্যিকারের ভালো মানুষ হতে গেলে মানুষকে বামপন্থী হতে হবে। সব চেয়ে ভালো হয় যদি সে কমিউনিস্টই হয়ে যায়। এই গুজবে যাঁদের বিশ্বাস যতো দৃঢ় তাঁরা ততোই জোরের সঙ্গে ভাবেন, সব ভালো মানুষই কমিউনিস্ট। তার পরেই প্রেমিসটা উলটে দিয়ে ভাবেন এবং বলেও বেড়ান, সব কমিউনিস্টরাই ভালো মানুষ। এর চেয়ে হাস্যকর—সোজা এবং উলটো দুটো প্রেমিসই—আর কী হতে পারে?

এই প্রসঙ্গেই কথাটা ওঠে। শক্তি কি প্রতিবাদী ছিল? বামপন্থী ছিল কি সে? কমিউনিস্ট ছিল? মিছিলে হাঁটত কি শক্তি? কোন মিছিল কেমন মিছিল ছিল তার?

হাঁটে তো সবাই। যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিনই হেঁটে যায়। নিজস্ব মিছিল থাকে প্রত্যেকেরই, প্রত্যেক মিছিলের থাকে নিজস্ব লক্ষ্য ও পথ। শিল্পী আর কবিদের তো থাকতেই হয়। শক্তিরও ছিল নিশ্চয়ই।

ব্যক্তি জীবনে বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠে কৈশোরকালেই। গনগনে যৌবন পর্যন্ত, প্রায় এক দশক ধরে ঘনিষ্ঠই থেকে যায় সম্পর্কটা।

পরে পার্টির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার পরেও সে চলে যায় নি কোথাও, যদিও খানিকটা সরেই থেকেছে।

চার বছর বয়সে পিতৃহারা শক্তির বাল্যকাল কাটে বহড়ুর গ্রামের বাড়িতে

দাদামশাই ডাঃ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তিনিই ছিলেন তার বাল্যের লতানে জীবনের খুঁটি। তার প্রথম উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলকও বটে, 'কুয়োতলা'ই তার সাক্ষী। তার বয়স যখন বছর পনেরো তখন মায়ের সঙ্গে তাকে চলে আসতে হয় বাগবাজারে মামাদের বাড়িতে। "মনে আছে সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে যখন অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই তখনই আমাদের চলে আসতে হয় বাগবাজারে মামাবাড়িতে। সালটা ছিল ১৯৪৮। না, লেখাপড়া বন্ধ হয় নি। ভর্তি হয়েছিলাম মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে।"[১]

সালটা ১৯৪৮। কলকাতা তখন ভয়ংকরভাবে আন্দোলিত এবং বিপর্যস্ত। একদিকে সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার জোয়ার, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার আবির্ভাব। শহরটার চেহারাই পালটে যাচ্ছে প্রতিদিন। উদ্বাস্তুদের অস্তিত্বের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী ঘোষণা। সে বছরই অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস মহম্মদ আলি পার্কে। পি. সি যোশি নিন্দিত, অপসৃত হয়েছেন তাঁর সময়ে অনুসৃত 'সংশোধনবাদী" লাইনের জন্যে। বি টি রণদিভের নেতৃত্বে গৃহীত হয়েছে 'প্রকৃত বিপ্লবী' লাইন। সে লাইনে পার্টি এগোতে না এগোতেই পশ্চিমবাংলায় পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে দিয়েছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার। কমরেডরা কেউ জেলে, কেউ কাজ করছেন আত্মগোপন করে। কারো কোমরে তখন পিস্তল, কারো ঝোলায় বোমা। কেউ কেউ আবার ঘুরে বেড়াচ্ছেন বেআইনী বই, পুস্তিকা পত্রিকা নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়েই শক্তিকে টান দিল তার প্রচ্ছন্ন স্বদেশ। কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছে চলে এলো সে।

"অষ্টম শ্রেণীতে যখন পড়ি সেই সময়ে ভূগোলের মাস্টার মশাই ছিলেন হরিপদ কুশারী মশাই। তিনি ছিলেন একজন পাক্কা মার্কসবাদী মানুষ। তাঁর সাথেই আমার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়ে ওঠে। তিনি বেছে বেছে আমাকে মার্কসবাদী সাহিত্য পড়াতে থাকেন এবং এইভাবেই একদিন ওই অল্প বয়সেই আমি ও আমার সহপাঠী সুনীল ভট্টাচার্য রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে ফেলি।"[২]

এই প্রবেশ নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত নয়। তাৎক্ষণিক ঘটনা হিসাবে মিলিয়েও যায় নি অচিরে। মঞ্চে প্রবেশ থেকে মঞ্চ থেকে সরে যাওয়ার মধ্যে সময়কাল পাক্কা এক দশক। এবং যে কলেজ স্ট্রীট মাতাল ও কবি শক্তিকে দেখেছিল পরবর্তীকালে এবং যে কাঙালও ছিল খুব—ভালবাসার কাঙাল—সেই কলেজ স্ট্রীট তাকে প্রথম দেখেছিল স্কলারশিপ পাওয়া এক কৃতী ছাত্র হিসাবে।

"ম্যাট্রিকুলেশন ভালোভাবে পাশ করে ভর্তি হলাম কলকাতার খ্যাতনামা প্রেসিডেন্সি কলেজে। বুঝতে পারছি শহরের অচেনা পথঘাট ক্রমশঃ আমার পরিচিত হয়ে উঠছে। স্কলারশিপ পেয়েছিলাম বলে পড়ার টাকা কিছুই লাগত না। উপরন্তু তিনমাস অন্তর কলেজ থেকেও যেন কিসের একটা বৃত্তি পেতাম যা বরাদ্দ ছিল কৃতী ছাত্রদের জন্য।"[৩]

কিন্তু মন দিয়ে লেখাপড়া করে 'মানুষ' হওয়ার জন্যে সবাই জন্মায় না। শক্তির মতো মানুষরা তো নয়ই। তার ওপর ইতিমধ্যেই সে কামড় দিয়ে ফেলেছে নিষিদ্ধ ফলে। কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং কলেজ স্ট্রীট অচিরেই দেখতে পেল আর এক শক্তিকে যে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের একজন অগ্রগামী সংগঠক কর্মী। তখনও 'পদ্য' লিখতে আরম্ভ করে নি সে, সবেমাত্র শেষ করে এনেছে তার প্রথম গদ্য 'কুয়োতলা।'

"বলতে দ্বিধা বা লজ্জার কিছু দেখছি না এই প্রেসিডেন্সি কলেজেই ছাত্রজীবনে রাজনীতির চঞ্চল হাওয়া আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে বইয়ে দিয়েছিলাম। তখনও পর্যন্ত কবিতা লেখার কোন চিন্তাই মাথায় জাবর কাটত না। ১৯৫১-৫২ সালেই কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের শাখা তৈরি করি আমরা। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তখনই নামকরা সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে আছে দীপেন, আমি আর অর্জুন সেনগুপ্ত ও আরও কয়েকজন মিলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র রাজনীতির বীজ বপন করেছিলাম। সেই অর্জুন সেনগুপ্ত বর্তমানে কেন্দ্রে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ··।"[৪]

বহড়ু থেকে শক্তির যে-মিছিল যাত্রা করেছিল তা তখন ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টির মিছিলের খুব কাছে চলে এসেছিল। অনেকটা যেন মিলেমিশে একাকারই হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন এসেছিল সে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে? তার ভেতরের কোনো টানই কি টেনে এনেছিল তাকে?

"পরান্নজীবী আমি ছোটবয়েসেই, পিতৃহীন। মনের মধ্যে তেমন পরাপর ব্যাপারটা ছিল না বলেই হয়তো বা একদিন থেকে বহুদিন কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে, কিছুকাল বা আপন খেয়ালখুশিতে, প্রেমে বা প্রেম-প্রকারে নিজেকে বয়ে যেতে দিয়েছিলাম।"[৫]

কিন্তু শক্তির ভেতরের শক্তির মতোই তার মিছিলেরও একটা চরিত্র ছিল যা একান্ত তারই। অস্থির, আবেগী, গতিবান, এবং অবশ্যই সৎ ও প্রতিবাদী। সম্ভবত প্রতিবাদী একটা স্বভাব এবং ক্রমাগত চলে যাওয়ার চরিত্র তার ভেতরে

গড়ে উঠছিল তার বাল্য-কৈশোরের দিন থেকেই। বিধির বাঁধন তার মনে হতো নিয়মের শেকল। বাগবাজারে মামাবাড়ির নানা সুখ, আনন্দ ও আমোদের স্মৃতির মধ্যেও তার মনে আছে,

"ভাইদের মধ্যে আমিই তখন বড়। সংখ্যায় ছিলাম মোট ১৪ জন। আমাদের লেখাপড়া ছিল একই স্কুলে। একই থান কাপড়ে তৈরী হতো সবার একই ধরণের পোষাক। বাড়িতে আসত নাপিত। সবার চুল ছাঁটা হতো একরকম ক'রে।"[৬]

যার জন্মই হয়েছে অন্যরকম হওয়ার জন্যে, তা-ও আবার যেরকম সেরকম অন্যরকম নয়, কবি হওয়ার জন্যে, বড় কবি, পাঁচজন থেকে তাকে পৃথক তো হতেই হবে। তার পক্ষে কি মেনে নেওয়া সম্ভব একই স্কুলে পড়া, একই ধরণের পোষাক পরা, একই রকম চুল ছাঁটা···ছাঁচে ঢালাই হয়ে সবার সঙ্গে একই রকম হয়ে যাওয়া! তলায় তলায় প্রতিবাদ জমছিল নিশ্চয়ই, হয়তো বা অজান্তেই। আর প্রতিবাদ মানেই তো নিয়মভাঙা, সে-নিয়ম যারই হোক, যে উদ্দেশ্যেই হোক। এবং একথা কে না জানে শক্তি তার সমস্ত পদ্যে এবং জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তে অবিরাম খেলে গেছে নিয়মভাঙার খেলা—যেন তাই তার প্রতিবাদ, যেন সেই প্রতিবাদই তার স্বাধীনতা আর মুক্তির সাধনা, চরম স্বাধীনতা—প্রায় স্বেচ্ছাচারই, এবং চূড়ান্ত মুক্তি—প্রায় মৃত্যুই।

অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টি এক গ্রেট লেভেলার। পার্টি চায় মননে ও কর্মে, সম্ভব হলে স্বপ্নেও, এক দেহে লীন হয়ে যাওয়া এক বাহিনী। ঐক্যবদ্ধ, অনুগত, সুশৃংখল, দায়িত্বশীল এক সেনাবাহিনীই চায় সে। শক্তির পক্ষে এমন হয়ে ওঠা কি সম্ভব? পার্টির কাছে এসে পার্টির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে··· "দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার কথা আমার তৎক্ষণাৎ। সবাই হয়। আমি হতে পারি নি।"[৮]

শক্তি তখন তার নিজের মিছিল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে অন্যদিকে স্বাধীনতা আর মুক্তি, প্রেম আর মৃত্যুর উন্মাদ এক দিগন্তের দিকে।

"ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের পড়ুয়া জীবন শেষ হয়েছে। পরপর দু'তিনটে চাকরিও পেয়ে যাই···ঠিক খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিলাম না···মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা···দূরে দূরে মফঃস্বলের জলা জঙ্গলের পথে ছুটে যাই সবুজের খোঁজে,···ঘুরে বেড়াই সারা পশ্চিম বাংলা। আমি তখন হয়ে উঠছি এক রোমান্টিক বোহেমিয়ান। অথচ ভবঘুরে নয়। মনে মনে আহরণ করে চলেছি কবিতার অজস্র গুল্মলতা।"[৮]

ভবঘুরে না হলেও এমন মানুষের মিছিল কি মিলতে পারে কমিউনিস্ট পার্টির মিছিলের সঙ্গে? এ-জীবন কি সঙ্গতিপূর্ণ কমিউনিস্ট নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে? ঐক্য আর আনুগত্যের জন্যে পার্টির দাবির সঙ্গে? এখানেই তো শেষ নয়। শক্তির মিছিল তখন ক্রমাগত চলে যাচ্ছে অন্য এক জগতের দিকে যার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির শুধু অমিলই নয়, বৈরিতাও ঘটে যেতে পারে।

"আমি বলতে গেলে, তখন থেকেই আমার এক ধরনের নিজস্ব জীবনযাপন শুরু করি। অহোরাত্র মদ খাই, অহোরাত্র পদ্য লিখি! অল্পবিস্তর দাড়ি চোয়ালে। লোকে বলত, একদম 'আউট' হয়ে গেছি।···যা বলে লোকে আমি শুনি তার একাংশ। শুনি আর কালা হয়ে থাকি। এক সময় স্বেচ্ছায় কালা, কানা, আউট এই সমস্তই হয়ে যাই।"[৯]

এই ভাবেই শক্তির মিছিল তার নিজের পথে চলে যায় প্রবল গতিতে।

"কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়েছি। ওঁরা খুব তেড়ে ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন বলেই হয়তো বা। তা ছাড়া তখন আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, আমি অসামাজিক।"[১০]

পার্টির কাজ থেকে সরে গিয়েছিল শক্তি। ভাবতে গিয়ে এখন মনে হয়, ভালোই হয়েছিল, তার পক্ষেও, পার্টির পক্ষেও। সরে গিয়েছিল বলেই হয়তো সে তার পদ্যের পতাকা উড়িয়ে দিতে পেরেছিল পাহাড় চূড়ায়, আকাশে, জলে ও জলস্তম্ভে, মাটিতে, জঙ্গলে, পাতালে এবং মৃত্যুর নাভিতে, পরম উল্লাসে আর বিপুল বিষাদে। আবার সরে গিয়েছিল বলেই হয়তো একেবারে চলে যায়নি, অন্য কোথাও চলে যায়নি। যেমন গিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি অনুগত কোনো কোনো কবি ও কমিউনিস্ট। হয়তো সেই জন্যেই আছে-কি-নেই আছে-কি-নেই করতে করতেও একটা সম্পর্ক থেকেই গেছে। কমিউনিস্টদের পরিচালিত, পত্রিকাগুলি, এমন কি পার্টির মুখপত্রও নির্দ্বিধায় হাত পেতেছে তার কাছে এবং সে-ও লিখেছে আনন্দে। কমিউনিস্ট বন্ধুদের প্রতি তার ভালোবাসায় যেমন টান পড়েনি কখনো। সে-ও তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছে অনেক। আর সেই জন্যেই মৃত্যুর অল্প ক-দিন আগেও পুরোনো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে, পার্টি ছেড়ে দেওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পরেও, সে অনায়াসে বলতে পারে। শান্ত গলায়;

"তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি। কলেজ স্ট্রীটে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ঢোকালাম তো আমরাই। ৫৮তে রাজনীতি ছেড়ে দিলাম···খুব দলাদলি শুরু

হয়েছিল। ভালো লাগল না। তবে এখনো কিন্তু সি পি. এমকেই ভোট দিই আমি।"[১১]

আমার দেখা এক শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ছোটখাট চেহারার মানুষ (যদিও তাঁর চেয়ে দীর্ঘদেহী আর কোনো মানুষ দেখিনি আমি)। কলকাতা কাঁপিয়ে বেড়ানো শক্তি দৈত্যের মতো দাপাতে দাপাতে তাঁর সামনে এসে পড়তেই কেমন সুবোধ হয়ে যেতো, দীপেন্দ্রনাথের স্নেহ আর শাসনের কাছে নত করে দিত মাথা, কলেজ স্ট্রীটের অসংখ্য সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রি তা জানে। দীপেন্দ্রনাথ চলে গেলে, অকালে, তার মতো শোক আর ক'জন পেয়েছে? সে শোক শুধু স্বজন হারানোর নয়, কমরেড হারানোরও বটে, অভিভাবকের মতো কমরেড, যে কিনা সাদর আঙুল তুলে··সাবধান করে দিত, "মাঝে মধ্যে বেঁকেচুরে" গেলে দীপেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে শক্তি লিখেছিল,

"বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।"
দীপেন্দ্রনাথের শেষ যাত্রায় আসেনি শক্তি।

আমাদের লেগেছিল তাতে। তখন বুঝিনি কেউ কোথায় লেগেছে শক্তির বুকের তলায় কোন গভীর গভীরে।

"ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারি নি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছো,
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে
কাছাকাছি।"

ভালো হয়েছিল, শক্তি সরে গিয়েছিল। সরে গিয়ে আসলে সে থেকে গিয়েছিল। যেমন রয়েছে আজও চলে গিয়ে এবং নিশ্চিত থাকবে, বহুদিন, আমাদের দক্ষিণ বা বাঁয়ে এবং ভিতরে।

[১, ২, ৩, ৪, ৬ এবং ৮ চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি সংবাদ-এর ১৪০১ শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় "এই যে নদী" (অনুলিখন কেয়া বাগচি) থেকে নেওয়া। ৫, ৭, ৯ এবং ১০ চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি "পরশুরামের কুঠার"-এ শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখিত "পদ্য গদ্য সম্পর্কে সামান্য" থেকে নেওয়া / ১১ চিহ্নিত উদ্ধৃতিটি সোনার বাংলার ২৫ মার্চ ৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত তপশ্রী গুপ্তের "শেষ সাক্ষাৎকারে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়" থেকে নেওয়া। দীপেন্দ্রনাথর স্মৃতিতে লেখা "তুমি আছো, সেইভাবে আছো" কবিতাটি আছে "প্রচ্ছন্ন স্বদেশ" কাব্যগ্রন্থে।]

কবিতারই পুরুষ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অবিমিশ্র প্রশংসা, অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, অবিরল প্রাপ্তি, নিঃশর্ত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ, আমাদের এদেশে, যেখানে মৃত্যুর আগে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও অবহেলাই একজন প্রকৃত সৃজনশীল মানুষের ভাগ্যে জোটে, দেখে এসেছি, সেখানে পাওয়া প্রায় লেখা শুরুর দিন থেকে পেতে থাকার নিদর্শন প্রায় নেই বললেই চলে; একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই শুধু তুলনা চলে যাঁর, সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু এতোটাই আকস্মিক যে তাঁর পাঠক, বন্ধু বা প্রিয়জন এখনো ধাক্কা সামলে উঠতে পারিনি। একজন কবিকে ঘিরে যে নির্জনতা, তা তাঁর ছিলো না, তিনি লেখার প্রায় সূচনাকাল থেকে অজস্রের দ্বারা পরিবৃত থেকেছেন; কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁকে অবহেলা করতে পারেনি—কারণ তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছেন; তিনি, এবং একমাত্র তিনিই যে লিখতে জানেন, তা নির্দ্বন্দ্বভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর আবৃত্তির কণ্ঠ ও ভংগী, ব্যক্তিত্বের সহজ আন্তরিকতা সমকালের অজস্র মানুষকে মুগ্ধ করেছে, কাছে টেনেছে; এমনভাবে নিজেকে সবদিক থেকে প্রকাশ করতে, তুলে ধরতে আর কোনো কবিই পারেননি, একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

ব্যক্তিত্বের এই আচ্ছন্নতা বা আবেগ না কাটলে প্রকৃত অর্থে তাঁর কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও কবিতার সঙ্গে তিন দশক ধরে জড়িয়ে থাকার জন্যে এমুহূর্তে কবিতা নিয়ে কিছু লেখা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে, কারণ যে দূরত্ব স্বচ্ছ দৃষ্টি এনে দেয়, যে কালিক ব্যবধানে অনেক আনুষঙ্গিক ধোঁয়া ধুলো ঝরে গিয়ে প্রকৃত রূপটি স্পষ্ট কোরে তোলে, সেই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্তত কুড়ি বছরের; যেমন জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে অনেকটা ও কিছুটা আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছিও।

যে কবি সমকালে সবকিছু দু'হাত ভরে পেয়ে যান, আমাদের অনেকেরই মনে হয়, তাঁকে আর দেবার কি আছে? তিনি যা দিয়েছেন- তাঁর চাইতে অনেক বেশি যদি পেয়েই থাকেন, তবে এই প্রশ্নও জাগে, নগদ বিদায় দিয়ে তাঁর প্রতি পাঠকের কর্তব্য বোধহয় সেরেই ফেলা হয়েছে। অন্তত তিনি কিছু সমাদর

পাননি বলে ভবিষ্যতের পাঠকের একটু বাড়তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আর আশা করেন না ; পাঠকও তাকে আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করেন না, করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হন না হয়তো আর।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় অজস্রপ্রসূ, বিরামহীন কলম চলেছে তাঁর ; গদ্য. অর্থাৎ উপন্যাস লিখেছেন দু'একটি, ভ্রমণ কাহিনী আর অনুবাদের সংখ্যা কম নয় ; তবে কবিতাতেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি, তাঁর নিজের জায়গা। সারাটা জীবন কবিতাকে ভালোবেসেছেন, কবিতার সঙ্গেই সহবাস তাঁর, জীবনের লক্ষ্যও ছিলো কবিতা সৃষ্টি।

কিন্তু সৃষ্টির জন্যে তাঁর প্রস্তুতিপর্ব দেখিনি, প্রথম থেকেই স্বভাবের টানে ভেসেছেন তিনি, লিখেছেন ইচ্ছেমতো, যখন তখন যেমন তেমন ক'রে কবিতা ; তার অর্থ এ নয়, রচনাদক্ষতার অভাব ছিলো তাঁর ; বরং সহজাত দক্ষতারই প্রকাশ দেখেছি কবিতায় ; হ্যাঁ, সহজাত দক্ষতা ছিলো বলেই একটা ছন্দজ্ঞান তাঁর ছিলো, সেই ছন্দের নানা মাত্রার খেলা খুলে যেতো তাঁর হাতে ; কবিতা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হতো না, ভাবাননি তিনি পাঠককুলকেও, বরং ছন্দের সহজ দক্ষতার বলে তিনি সংপ্রশংস বিস্ময় কেড়ে নিয়েছেন—

> প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
> তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশান।
> কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো
> ও-ফুলের কথা বলো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ
> মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ে
> বাগানে ঘুরেছে স্খলিত নিদ্রা, কেই বা দুপুরে
> ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁ ঝাঁ গায়ে গায়ে
> ফুরোয় সন্ধ্যা ফুরোয় দুপুর শুধু জলরেখা শুধু জলরেখা
>
> কারনেশান / হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য

মাত্রাবৃত্তের ছন্দে-স্ফূর্তি কবিতাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে ; এখানে রহস্যময় একটি পরিবেশও দেখছি। ছবি নয় চিত্রকল্প ? যাই হোক ছন্দের মধ্যলয় আমাদের মনে দুলুনি দিতে থাকে।

এই যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, কবি তাকে নানা ভাবে ব্যবহার ক'রে গেছেন সারা-জীবন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই ব্যবহার তাঁর ; এবং এর সম্মোহে পাঠক

প্রশ্ন করতে ভুলে গেছেন, কবিতাটি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কোন বোধ উন্মোচিত হলো এই কবিতার দ্বারা।

আমি খুঁজে ফিরেছি কোথায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রস্থানভূমি। কি লিখতে চেয়েছেন বা চাচ্ছেন তিনি সারাজীবন ধরে; জগৎ ও জীবনের কোন রহস্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে, কোন 'অনুভূতি দেশে'র উন্মোচন তাঁর লক্ষ্য। একজন কবির কাছে এই প্রত্যাশা একজন পাঠকের থাকতেই পারে; আর সেই প্রাপ্তির টানেই তো পাঠক মোহমুগ্ধ হয়ে তাঁকে আবিষ্কার করবেন, বুঝে নেবেন।

আজীবন একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, প্রেমিক ও উদাসীন কবি হলেন শক্তি। পারিপার্শ্বিক জীবন নিয়ে, রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে, পৃথিবী-বদলের স্বপ্ন নিরে তাঁর মাথাব্যথা ছিলো না। কিন্তু বিস্ময়ভরা প্রেমিক-দৃষ্টি ছিলো, তা দিয়ে কখনো প্রিয় মানুষকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, কখনো নিজের বিশ্বাস ও বেদনাকে। কি চেয়ে, কি দেখতে চেয়ে এই নৈরাশ্য ও বেদনা, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, তবে দুঃখের গভীরতা ও উদ্দাম প্রকাশ অনুভব করেছি। কোনো কাব্যিক তত্ত্ব অর্থাৎ কবিতায় নান্দনিক সীমা প্রস্তুতি নিয়ে ভাবনা আমার দৃষ্টিতে পড়েনি; কিন্তু কবিতায় ধরা পড়ে, ব্যক্তিগত জীবন-সচেতনা তাঁর প্রখর। আর রয়েছে অপরিম্লান রোমান্টিকতা; এক অর্থে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আপাদমস্তক সারা জীবনই রোমান্টিক রয়ে গেলেন; এই রোমান্টিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা মিস্টিক উপলব্ধি কখনো কখনো। প্রকৃতিকে, নারীকে, সমগ্রভাবে মানুকে তিনি দেখেছেন রোমান্টিক-বিষাদ-জড়িত চোখ দিয়ে; তাই 'ছিলো' ক্রিয়াপদের ব্যবহার অজস্র; রোমান্টিক নসটালজিয়া ছিলো কবির সর্বক্ষণের সংগী।

কোথা বসেছিলে? যাবার সময় দেখছি শুধুই
ঝরছে পাতার শিখর গলানো কার এলোচুল।
অবসাদ আর নামে না আমার সন্ধে থেকে,
ছুটে কে তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চারি ধারে?

ফিরেছি, তোমায় দেখবো, তোমায় দেখতে পাচ্ছি
হয়তো তোমার স্ফটিক জলের মতন বেঁকানো
কানের পাতার তল বেয়ে ওড়ে চুলের গুচ্ছ
তোমায় আলোই তোমার মধুর করেছিলো একা।

/ অন্ধকার শালবন

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো।

তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না

স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে কি করেছে চুরি না আমাদের

সেই হারানো পথগুলি, স্মৃতিগুলি

তারা আমাদের বলে গেলে হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি

আমরা অনুভব করলাম আবার—সেই সব হারানো গল্প

যা আমরা এতাবৎ কাল হারিয়ে এসেছি

/ আমরা সকলেই

১৩৬৭-তে রোমান্টিক স্বপ্ন-কাতরতার শুরু, ১৩৭৮-এও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবং ১৯৮২-তেও

যে-দুঃখ পুরনো, তাকে কাছে এসে বসতে বলি আজ

আমি বসে আছি, আছে ছায়া, তার পাশে যদি দুঃখ এসে বসে

বেশ লাগে, মনে হয়, নতুন দুঃখকে বলি, যাও

কিছুদিন ঘুরে এসো অন্য কোনো সুখের বাগানে

/ পুরনো নতুন দুঃখ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বাক্‌ভংগি কথ্যভাষার বাক্‌রীতিকে আশ্রয় ক'রে বলেই, পাঠের সময় কবিতা ও পাঠকের মধ্যে কোনো শ্রম-সচেতনতার প্রয়োজন হয় না। এ একটা এমন প্রবণতা যা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে টানে, আমি কথা বলার ঢং কবিতায় অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে, কারণ ভাষার নিজস্ব চরিত্রের বিপর্যয় ঘটিয়ে পাঠকের আবেগকে, বুদ্ধিকে স্পর্শ করা যায় না।

আমরা দন্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই

মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে!

অথবা—

মাথার ভিতরে এক বোধ কাজ করে,

আমি তাকে পারি না এড়াতে ;

/ জীবনানন্দ দাশ

অথবা

যমও নেয় না তাকে আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে।

/ বিষ্ণু দে

এই পংক্তি গঠন-রীতিতে কোথাও কথা বলার স্বাভাবিক ধাঁচকে বিপর্যস্ত করা হয়নি. অথচ চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে দু জন কবিরও মেরুপ্রমাণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও কবিতার জন্যে স্বতন্ত্র ভাষারীতি গড়ে নেননি ; অথচ তাঁর নিজস্ব উচ্চারণ স্পষ্ঠ, ঋজু ও শোণিতগন্ধী হতে পেরেছে—

এই হাসপাতালে এসে দেখি শুধু আমার অসুখ।
আর সবাই সুস্থ, প্রাণবন্ত, শুধু কড়িডোরে হাঁটে—
এদিকে—ওদিকে যায়, জানলায় দাঁড়ায়, পাখি দ্যাখে,
পাখিদের সঙ্গে কিছু কথা বলে,'খবর কাগজ
এখানে আসে না।

/ বলো, ভালোবাসো।

সারা জীবন শক্তি এই চরিত্র বজায় রেখেছেন. ফলত পাঠক ও কবিতার মধ্যে সেতু-বন্ধন ঘটেছে সহজেই, যা আমাদের সকলেরই অভিপ্সিত, অথচ অতিরিক্ত 'অরিজিন্যাল' হবার লোভে শব্দ কি ভাবে বসানো যাবে, তা নিয়ে অনেক কবিকেই ব্যর্থ পণ্ডশ্রম করতে দেখা যায়।

এবং বাচনভঙ্গির এই অকপট স্বচ্ছতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক অনেক কবিতার পংক্তিকে দিয়েছে প্রবচন চরিত্র ; অর্থাৎ অকৃত্রিম উচ্চারণ-সারল্য মনের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছে মর্মে—

১। কখনো দেখিনি তাকে, কিন্তু তার মুখময় পরিত্রাণ
লেখা হয়ে আছে

২। ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু, দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে

৩। সুন্দরের আয়তন জেনেছে সুন্দরই

৪। কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
হাওয়া লেগে

৫। এখন শুধু ভালোবাসায় ভর করে এই রাস্তা হাঁটি

এ রকম অনেক, অজস্র পংক্তি শুধু আন্তরিক অনুভব ও পরিচ্ছন্ন প্রকল্প-বৈশিষ্ট্যে বারবার মনে পড়ে, আনমনে উচ্চারিত হতে থাকে।

মূলত, স্বাভাবিকতাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভূমি ; তার অর্থ এই নয়, অস্বাভাবিকতা কবিতার শত্রু। কবিতা নানাভাবেই হ'তে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কবিতাকে হয়ে উঠতে হবে কবিতা-ই। যার স্বভাবেই কবিত্ব, তার উচ্চারণ

হয় স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, আর এই কারণে সরলও বটে। এখানে সচেতন নির্মাণ প্রশ্রয় পায় না ; স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার প্রাণ হলো আবেগের চাপ, সেখানে শব্দগুচ্ছ বা বাক্‌প্রতিমা উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতিকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায় ; আর যে কবিতা আবেগের শাসনে এসে গঠনের খাতে বয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, সেখানে এই স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না ; সেখানে সচেতন রীতি কৌশল ভিন্ন পথ গড়ে তুলতে চায় ; সেই পথও কবিতার পথ।

অবশ্যই, আধুনিক একজন সচেতন লেখক কলাকৌশল-সচেতন হবেন, আমরা আশা করি। তা না হলে গ্রাম্য কবিয়ালও কবিরূপে গ্রাহ্য হয়ে উঠবেন। কবিয়াল আবেগের বশ, আর নাগরিক সচেতন কবি আবেগের শাসক। আবেগের মোক্ষণ চাই, আবেগের মুণ্ডুচ্ছেদন চাই না। অমিয় চক্রবর্তীর বা কামিংসের কবিতার অতিরিক্ত রীতি-সচেতনতা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে খুব বেশি ওরিজিন্যাল হবার চেষ্টাটাই অ্যাবরিজিনাল হয়ে ওঠে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আবেগকে বর্জন করেননি, আবার সচেতন প্রকরণ নির্মাণে, তা-ও নয়। তিনি নিজের মতন করে স্বাভাবিক কবিতা লিখেছেন ; কখনোই খুব বেশি অরিজিন্যাল হতে চাননি ; যতোটা সম্ভব পূর্বসূরিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন কবিতার প্রয়োজনে ; কখনো কখনো মনে হয়েছে, বোধহয় অনুকরণই করেছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দকে। বাংলার এই দুই মহৎ কবির কাছে অনেক-অনেক কবির মতন শক্তিও হাত পেতেছেন, তবে নিজস্বতাকে ত্যাগ করেননি ; করেন নি, কারণ স্বভাবেই তাঁর কবিত্ব, তাঁকে বানিয়ে লিখতে হয়নি, কারণ কবিতা লিখতেই এসেছেন তিনি ; আর পাঁচটা সার্থকতার পেছনে ঘুরে বেড়াননি, যা কিছু চাওয়া ও পাওয়ার স্বপ্ন তা কবিতার কাছ থেকেই ; ফলত যা কিছু নিয়েছেন তা'ও কবিতার জন্যে ; হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন মুহূর্তের জন্যে, যা ঋণ তাকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হয় ; ভিক্ষের চাল ভাত হলে কোন ভাবে তা আহৃত, বোঝা যায় না। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই ক্ষেত্রে কিছু অমনোযোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভালো, উত্তীর্ণ কবিতার বিপুল সংখ্যাধিক্যের জন্যে এই সামান্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া জরুরি বলে আমি আদৌ মনে করি না।

আমাকে দাও কোল

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুই যে মনে রাখতে পারি না, সেটা বড়ই অসুবিধেয় ফেলে আজ কিছুটা বয়স পাওয়ার ফলে। কবে যে প্রথম আলাপ হয়েছিল এবং বন্ধুত্ব তৈরি হল, কিছুই বিস্তারিত মনে পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হবে। এ ব্যাপারে শক্তির প্রথম জীবনে স্ব-নিয়োজিত দেহরক্ষী আমাদের বিশেষ বন্ধু নিমাই চট্টোপাধ্যায়, যে ছিল ওর সঙ্গে ছায়ার মত, মধ্যরাত পার হবার আগে ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেত, সেটাই ছিল তার দায়, কর্তব্য ও ভালবাসা। শক্তির কোন একটি বই-এর ব্যাক কভারেতার একটা লেখা দিয়েই শুরু করি। নিমাই লিখছে, "শক্তি পৃথ্বীশ অনেক দিনের বন্ধু। পৃথ্বীশ বলে, সে বাপু পেরথম যৈবনের ; শক্তি বলে ন্যাংটো পোঁদের। শক্তি পৃথ্বীশকে দুলু ডাকে, পৃথ্বীশ শক্তিকে শক্তি। মায়ের কাছে খোকা ছাড়া শক্তির কোন ডাকনাম নেই। দুলু ছেলেবয়সেই মাকে হারিয়েছে শক্তি বাবাকে।"

"রক্তের ভিতরে এক বোধ শক্তিকে অন্যরকম বানিয়েছে, রক্তের ভিতরে এক বোধ পৃথ্বীশকেও। শক্তির প্রথম বই-এর মলাট পৃথ্বীশের করা, পৃথ্বীশের গোড়ার আঁকা শক্তির ঘরে টাঙানো।"

প্রথম দিকে পনের/কুড়িটা অর্বাচিন বছর বাদ দিলে এ-জীবনের বাকি চল্লিশটা বছর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত থাকার এক বিরল ধারাবাহিক সুযোগ হয়েছে, এখন এভাবেই ভাবছি। ওর সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, কোথাও গিয়ে বসব বা বাড়িতেই, সেটা ছিল একটা অভ্যাসের মত। বন্ধুতায় ছোটবড়, লঘুগুরু কিছুই বিচারের অবকাশ হয়নি। পৃথিবীতে অবধারিত রূপে আলাপ বন্ধুত্ব প্রেম এইসব গড়ে উঠেছে দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগের ফলে। ও চিঠিপত্র লিখতে পারে না, মানে লেখার মত সময় ওর হাতে থাকে না কখনও। তাও খানকতক লিখেছে দুঃখিত চিত্তে আমার বোম্বেতে থাকার সময়। সম্পর্কটা যতটা যত্নে ব্যাকুলতায় আগলে জল সিঞ্চন করা হয়েছে, এইসব চিঠিগুলি থাকলে পরিষ্কারভাবে ওকে বুঝতে সাহায্য হত। কলকাতায় না থাকাটা ওর বিলকুল বেপসন্দ ছিল। বরাবর চাঁদ হয়ে শুধু বলে গেছে, আয়, আয়। তা, সেই তো শেষ পর্যন্ত ফিরতেই হল বছর পাঁচেকের মধ্যে। বাইরে থাকার সময় সংগঠক সম্পাদক ও কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বন্ধপরিকর রূপে কবিতা সাপ্তাহিকের পালক পিতা। এবং সম্ভব হলে প্রতি সংখ্যায় নতুন প্রচ্ছদের স্বপ্ন নিয়ে এক বছরের জন্য গোটাপঞ্চাশেক মলাট এঁকে পাঠিয়ে দাদারের বাড়িতে বা অফিসে বসে ফিরতি ডাকের আশায় চনমনে হয়ে ঘুরঘুর করতাম। পেয়েছি ঠিকই, গোটা তিনেক। মনে করে ঠিক ঠিক ডাকটিকিট লাগিয়ে ডাকবাক্সে ফেলা যে কতটা শ্রমসাধ্য ছিল, সেটা বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বোম্বেতে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার স্টুডিওতে বসে পনের-ষোলটা কাগজ এক বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে মনে হত, বাংলা কবিতা সাপ্তাহিকের ঝাণ্ডা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। হেমন্তের অরণ্যে ঐ পোস্টম্যান উড়ে পুড়ে জ্বলে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। নিজস্ব বিশেষ এক গঠন-প্রণালীতে বিশাল পক্ষ বিস্তার করে শুষে নিচ্ছে চারপাশের ঘন বনরাজির সমুদয় ক্লোরোফিল। আকাশের আলো, বাতাস, মাটিতে, ঘরে বাইরে, সকল পানশালায় তরল আগুনের তীব্র লীলা, কারণে এবং অকারণে শুধু মধ্যরাতে নয়, ওর মেদিনী দুপুরেও ভেসে যেত, ভাসিয়ে দিত, ভাসিয়ে নিত অতি অনায়াস দুর্দম কৌলিতে। অতি প্রখর স্রোতস্বিনী নদীর জলধারা অপেক্ষা দ্রুততর ছন্দে লয়ে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে দিত অন্যদের অনায়াসে। হাসিটি ছিল বড় প্রাণবন্ত ও সরাসরি। নির্দয়ভাবে খণ্ড-তংগুলি আলাদা করে ফেলতে পারত অবলীলাক্রমে এবং সর্বদা। তা না হলে যে নিজেকে রক্ষা করা যাবে না, সেটা, সহজেই বুঝেছিল। এ সবই হচ্ছে পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের, কখনও সত্তর দশকে আমাদের সকল বন্ধু-বান্ধবের অসহায় কাতর ছট্‌ফটানি, যা অনেকেই সইয়ে নিয়েছেন এবং অপ্রতিহত গতিতে তা শুধু এগিয়ে যেতে থেকেছে। জীবন সর্বভাবেই যে অতি সুমিষ্ট ছিল, তা তো বলা যাবে না। পথ খুঁজে পেলেও সেই জ্বালা-যন্ত্রণার উপশমের ঔষধগুলি অনেকের খুঁজে বেড়াতে হয়/আমরা জানি সে-সন্ধান একবার শুরু হলে শেষ খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন হয়।

শক্তিকে কোন কিছুতেই কখনও পরাজিত দেখেছি বলে মনে করতে পারি না। জীবিকার, ব্যাপারেও, স্থিত হবার পূর্বে পেরিয়ে গেছে অসংখ্য বয়সোপযোগী রোমাঞ্চক কাহিনী। নানা কোন থেকে প্রেম হাতছানি দিয়ে ডেকে গেছে। একটু আধটু সদ্যতর কোন আস্বাদ টেনে রেখেছে, মায়ায়, বেঁধেছে। নীল যমুনা পাড়ে সকলেরই আছে কিছু বৃথা অভিসারের স্মৃতি।

তো, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কিছু বেশি পয়সা উপার্জন করা খুবই দরকার, আর একটু না বাড়লে সন্ধ্যার আচমন ও বিহার বড়ই বাধা পেয়ে পেয়ে থেকে থেকেই

মুখ থুবড়ে পড়ছে। অতএব সম্মানজনক উপায় বেরিয়ে এল, নামী টিউটোরিয়াল বা কোচিং সেণ্টারে কিছুটা সময় দিলে সন্ধ্যার, সামান্য, আয়-ব্যয়ের একটা সুরাহা হয়। অন্তত কিছুটা আহ্লাদে হাসি খুশি সময় যাপন সম্ভব হয়। বিস্তর খোঁজ খবর করে শক্তি যোগ দিল হ্যারিসন রোডের এক কোচিং সেণ্টারে। স্বভাবতই কতকগুলি ছেলেমেয়েকে অকারণ পড়া-পড়া খেলায় আটকে রাখতে গিয়ে তাদের পড়াশুনার কতটা কি এগিয়েছে সে চিন্তা না করেও কিযৎকালের মধ্যে প্রভূত ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রদ্ধা ভালবাসায় আঁকড়ে জড়াল। লোকটা ভালবাসায় বড়ই জব্দ থেকেছে সর্বদা। ছেলে-মেয়েগুলির সঙ্গে শুরু হল গভীর প্রেম, সখ্যতা ও অভিভাবকের মত স্নেহ, প্রশ্রয়ের আদান-প্রদান। এখন নিমাই-এর লেখা থেকে বলি, "শোনা যায়, ঐ সময় কলকাতায় একটা টিউটোরিয়াল হোম হয়েছিল। শক্তি ছিল তার প্রিন্সিপাল, পৃথ্বীশ টীচার। শক্তি স্তোক দিত ভাইস প্রিন্সিপাল। ক্যাশ বাক্সের দুটো চাবি দুজনের কাছে থাকত—কে আগে খুলতে পারে!"

সে সময় মেয়েদের ফাইন আর্টসের ইতিহাস এই ঐচ্ছিক বিষয়টি কোন কোচিং সেণ্টারেই চালু ছিল না। সেই শীর্ণ সূত্র ধরে আমারও হাজিরা শুরু হল। কদিন পরে, কিছু জানি না, হঠাৎ এসে বলল, চল, বাড়ি পাওয়া গেছে, দুটো ঘর বৈঠকখানায়, এখানকার কোচিং সেণ্টার থেকে জনা আশি ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে পড়বে। একটু খাটুনি বাড়ল, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর না বলতে পারলাম না। তুই থাকবি আমার সঙ্গে। স্বভাবত আমরা অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সম্বোধনে তুই বলি না। সর্বদাই মিষ্ট ভাবে তুমি বলতে অভ্যাস করেছি। কিন্তু এমন একটি উত্তেজক সময়ে অনেক কিছুই আমাদের আচরণে ব্যতিক্রম হতে থাকল। তা হোক। বৈঠকখানায় বাজার ইত্যাদি পেরিয়ে শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের নতুন নালন্দা প্রতিষ্ঠিত হল। বস্তুত সম্মানজনক এক ব্যবসায় দুই বাঙালি যুবক এলেন গঠনমূলক জীবনমুখী শিক্ষাদান প্রকল্প নিয়ে। এবং বলতে নেই, অচিরাৎ ছেলেমেয়েরা অনেকেই নিজ মতে জীবনে উন্নতি করেছেন। আমাদের চেয়ে বাস্তবে অধিকতর স্বীকৃত সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেক ছাত্রকেই মনে পড়ে, অনেক ছাত্রীকে দেখতে ইচ্ছে করে। ছেলে মেয়ে সংসার জীবনের সফলতা তাঁদের কাছে কেমনভাবে এল জানতে সাধ হয়।

আমার তো মনে পড়ে না যে আমাদের সেণ্টারে হিসেব রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল। যত্র আয় তত্র ব্যয় ছিল আমাদের ব্যবস্থা। সকলের কথা মনে পড়ে না, তবু, সেই সেণ্টারে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কালের প্রায় সকল কবি

সাহিত্যিক শিল্পীই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করেছেন, যা এই দুঃখজনক বিয়োগের অবসরে মনে পড়ে গিয়ে স্বীকার করে নিতে ভাল লাগছে। বিনয় মজুমদার, বাসুদেব দাশগুপ্ত, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, অরূপরতন বসু, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শক্তি নিজে এবং আমি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যথার্থই যেন আমাদের জন্যই তৈরি হয়েছিল। বাইরে প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে তারা পরিতৃপ্ত হত না। পাঠক্রমের বাইরে আমাদের খোলামেলা অকপট আচরণ ও জীবন যাপন ওদের স্পর্শ করেছিল, আকৃষ্ট করেছিল। দুদিন কাউকে দেখতে না পেলে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া এবং খবর করা আমাদের বিশেষ সচেতন এক দায় হয়ে গিয়েছিল। সকাল আটটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে পড়ানর কাজ থাকত। এই পড়ানর ব্যাপারটুকু সকলেই ভালবেসে ফেলে-ছিলাম। নেশা ধরেছিল, অনেকগুলি কাঁচা মাল থেকে পূর্ণ মানুষ নির্মাণের দায়, তো, স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম। আমাদের স্বাভাবিক বাউন্ডুলে জীবন-যাত্রা তাতে কিছুমাত্র ব্যহত হয়েছিল তা কিন্তু নয়। লক্ষ্য রাখবেন, এই প্রসঙ্গে, ক্ষণস্থায়ী হলেও ডিরোজিও প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। এবং গর্বের সঙ্গে। অন্তত গুটি কতক বালক-বালিকাকে মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা পেয়েছি। আমাদের সহজ মানসিকতায় বিভিন্ন সময়ে বিশ্রাম্ভালাপের সময় সরাসরি পানশালায় বাইরে সহজ ধৈর্যভরে অপেক্ষা করতে শিখেছিল। বা শিক্ষাক্রমের প্রতি বিশেষ উদাসীন থাকলে বিনীত প্রার্থনায় সেন্টারে ফিরিয়ে আনত। আমাদের তেমন কোন বিপদ আসেনি, কিন্তু তারা জানসহ হাজির থাকত সর্বদা। জীবন যে রকম, ছোট বড় সবকিছু খোলা চোখে দেখতে শিখেছিল। জেনেছিল জীবন কি রকম হওরা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের কারুর কোন জড়তা রাখতে দিইনি আমাদের আচার আচরণে। ওদের সকলের কাছেই আমরা অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও অলৌকিক শ্রদ্ধা পেয়েছি। এখন তাদের কথা ভাবতে বুক ভরে ওঠে। কখনও কখনও তাদের সঙ্গে দেখা হয়; যে কথা আগে কখনও বলেনি সেই কথা অনেক আদরে জেনে নিতে চেষ্টা পাই। খুশি মনে হাত নেড়ে বিদায় নিই। ভাল থেক তোমরা। সর্বদা এই কথা বলি। বহুদিন ওদের নিয়ে এক রকম নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি দুজনে। তৃপ্ত মনে নবোদ্যমে পানশালায় গেছি। ভাল লাগল, এই সেদিন এপ্রিলের ১২ তারিখ নন্দনে শক্তির স্মরণ সভায় কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থেকে শক্তিকে প্রণাম জানিয়ে গেল। সবাই সেই আনন্দময় দিনগুলি মনে করিয়ে দিল। কিন্তু

জানেন, বেশি দিন কি এমন এক নিয়মে এইসব গঠনমূলক কাজ করা সাজে আমাদের? আরও বড় কোন কাজ কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল না? প্রথমে শুরু বিভিন্ন ব্যাচের, সেই ক্লাস এইট থেকে কলেজের নিচের দিক পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা, আমরা যাদের মনে করতাম আমাদের হাতে তৈরি, তারা চলে যাওয়ার পর আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করে। এবং আমাদের আপন আপন কর্মলোক আমাদের অন্য পথে ক্রমেই সরিয়ে নিতে থাকল। আমি কলকাতা ছাড়লাম, মানে, ওকেও ছেড়ে গেলাম! যা কিনা সে-সময় সে মোটেই বরদাস্ত করেনি। আমার নিজেকে বেশ দলছুট মনে হত। একটা প্রয়োজনীয় এম-এ পরীক্ষা দিয়ে ভদ্র গোছের কলেজ শিক্ষকতার আশায় বিনা মাইনের ছুটিতে কলকাতায় এসে আর ফিরে যাওয়া হল না। বুঝে গিয়েছিলাম সকলকে ছেড়ে আমার একা একা কিছু হওয়া অবাস্তব পরিকল্পনা! নিজ ধর্মে নিধনই অনেক প্রিয় হল।

আমার কিন্তু মনে হয় না, বড় কথা বলছি, ডিরোজিও বেশি দিন বাঁচলেন না, সেটা আমাদের বড় বেশি অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্থ করে রেখেছে। কিছু ক্ষতি কখনও পূরণ হয় না। বিশ্বাস করি না যে, সময় সব কিছুকে মসৃণ করে, সহনীয় করে। অনেক ক্ষতি ও ক্ষতই আজীবন দগদগ করে, রক্ত ঝরে, তীব্র বেদনা মোচড় দেয়, অনবরত দেয়, দিয়ে যায় এবং আপন শরীর মন নিয়ত ক্ষয় পেয়ে যায়, ক্ষয় হতে থাকে। এভাবে আপনজনের বিয়োগব্যথা কুড়ে কুড়ে সবটা খেয়ে ফেলতে চায়। অকালে ঘুণ ধরে শরীরে মনে মনে, তখন বন্ধু-প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, তার তীব্রতা, শোক দুঃখ সুখ সকই প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে, অবশ রাখে, বিবশ করে। শরীরে মনে নতুন করে শক্তির জন্যই শক্তি সংগ্রহ করতে বিশেষ চেষ্টা পেতে হয়। হায়! তা আর হয় বা হবে এ বয়সে এমন উপায় কিছু খুঁজে পাই না। আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেল না, কিন্তু, আমাদের অনেক কিছু দস্যুর মত ভয়ংকরের মত লুঠে নিয়ে আঁধারের শূন্যতায় বেগে হাসতে হাসতে চলে যাওয়া কি যথেষ্ট ক্রুয়েল মনে হয় না? আমার তো মর্মান্তিক মনে হয়। তোমরা কি বল? তোমার বিবাহের দিনে আমরা বর্ণাঢ্য কিছু অভিনব সজ্জার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। অনেকেই সে সবের ডিটেল ভুলেছি। প্রচুর ছেলেভুলান মুখোশ পরেছিলাম সকলে। বিয়ের চিঠিটাও এমন হয়েছিল যে বেশ কয়েক বছর ঐ চিঠিতেই বিবাহবার্ষিকীর নিমন্ত্রণপত্রের কাজ চলেছে। আজ বোধহয় সে চিঠি আর অবশিষ্ট নেই, কিন্তু কবি ও কাঙাল বন্ধু মানুষটির জন্য অন্যতর

চিঠির বিপুল প্রয়োজন দেখা দেবে। প্রতিদিন না হলেও বছরের কটা দিন স্মৃতি-ভারাক্রান্ত সাঁঝের লগ্ন আমাদের ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, নেশায় না-নেশায় হাতড়ে বেড়াবে। এভাবেই কিছুকাল পরে আমাদেরও দিন ফুরাবে।

আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ঘটনাটা অলৌকিক একেবারেই নয়, সন্ধেটা, সব কাজ শেষে ওকে মনে রেখে আবশ্যিক নেশার পর বাড়ি ফিরছি, সবদিন ট্যাক্সি চড়া যায় না, সাহস করে বাসে ট্রামে ঘরে ফিরব, তা সেদিনটা ছিল ৩ এপ্রিল, হঠাৎ দেখি, একটা বাসের গেটে ঝুলতে ঝুলতে ঝুঁকে পড়ে হাঁক দিল, দুলু, তাড়াতাড়ি আয়, এটাতেই যাব শ্যামবাজার। চেহারা অবিকল মেদহীন পুরাতন শক্তির মত। অধর দাস লেনের উঠানে তিনটি বা একটি নারকেল গাছ ছিল। অন্য আরও দু এক রকম যথা, তুলসী গাঁদা মল্লিকা ইত্যাদি গাছ হয় তো ছিল, তবে, ছোট্ট অন্ধকার ঘরের উঠোন পেরিয়ে সামনের ঐ নারকেল গাছ থেকে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের ছোট বড় শূন্য বোতল ঝুলে থাকত। বাতাসে দোল খেত, গায়ে গায়ে গেলে টুংটাং শব্দ তুলত। সেই বোতলগুলির জন্য দ্রাক্ষা মোচনের দায়ভার কে বহন করত? ১৯৬৪ সালে হিন্দি সাপ্তাহিক ধর্মযুগে এ চিত্রটি তৎকালে ক্ষুৎকাতর শক্তি চট্টোকে লেখা একটি চিঠি, এই সাজে একটি লেখা আমাকে লিখতে হয়েছিল। এবং তাতে শক্তির চেহারাটি ছিল অতি মন-যোগে আকুতিপূর্ণ ভালবাসায় তীব্র হয়ে হাত মেলে মেলে দিচ্ছে টান টান করে মাটির দিকে, আঙুলগুলি থেকে শিকড় বাকড় বেরিয়ে মাটির ভিতর চলে গেছে। কারণ ততটা তীব্র প্রেম তার ছিল মাটির প্রতি, গাছের প্রতি, নেশার প্রতি, জীবনের সব কিছুর প্রতি ওর বিশেষ সরল আনুগত্য ছিল। বাছবিচার, জাতপাত, ঠাট্টা বট্‌কেরা এসব কদাপি ছিল না। এ বিষয়ে সব কিছু মিলিয়ে ও যে কতটা জ্যান্ত ছিল এবং কতটাই বা তার ব্যাপ্তি ও প্রসার তা না বুঝলে ওকে জানতে বুঝতে কষ্ট পেতে হবে। লুকানর তো কিছুই ছিল না, সর্বদাই ছিল দেখা বিন্তি খেলা আর মজা আর মজা। মৃত্যু মৃত্যু ঝোঁকও যে কিছুটা ছিল না তা-ও নয়। সেই সব খেলতে খেলতে মৃত্যুগুলি সকলেই অবহেলে পার হয়ে এলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ তুমি কি করে বসলে! উচিত হয়নি। আমাদের সকলকেই আরও কটা বছর তোমাকে ছাড়াই দুঃখিত অভাববোধ নিয়ে কাটাতে হবে। দেখা হবে নিশ্চয়ই, দোস্ত! দেখ, আগে গিয়েছ বলে নিজেকে বদলে ফেল না। আমরা তো তোমার ফেলে যাওয়া তোমাকে নিয়েই থাকব। মনে রেখ!

তোমাকে নিয়ে আমার আরও কথা আছে। অনেক কথা আছে। এখন আমার

সময় অঢেল, সব বলব। এক্ষুনি বা আস্তে ধীরে পরে। সবটুকু বলতে না পারলে বেদনা লাঘব হবে না। এখন আমার কোন কাজ জানা নাই যা লয়ে বসিব পশ্চিমের বারান্দায়। আমার স্ত্রী তোমার বড় বুড়ি এবং কন্যা ছোট বুড়ি তোমাকে কতটা জানেন বা চেনেন, আমি ঠাহর করতে চেষ্টা করি না আর। তুমি তাদেরও বড় ভালবেসেছিলে, কিন্তু তারা কোনদিন তোমার কাছে যায়নি। হঠাৎ তামাকে বেলালকে নিমাইকে টুটুকে বাড়িতে দেখেছে। আমার বেদনার্ত দিকটি নিয়ে তোমার মমতা আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত রাখত সদাই। আপন-জনের জন্য সব কিছু সমাধানের চেষ্টা ও সুখ প্রস্তাব তোমার ছিল অকৃপণ।

কালই পয়লা বৈশাখ, তাই মনে পড়ে গেল। জান, একবার তুমি কি করেছিলে? নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে নানা সময়ে সহজ লীলায় অনায়াসে করে ফেলেছ আগে, সেবার ১লা বৈশাখের দু-চারদিন আগে সকলে মিলে আমোদ আহ্লাদ শেষে আমাকে সরাসরি সক্কালবেলা বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসলে। বচ্ছরকার দিন, আর তোমার বাজার করার পদ্ধতি ছিল নিপুণ। যারা বাজার করতে আনন্দ পায় না তারা বুঝবে না। অসীম মমতায় তরি-তরকারি কেনার সেন্সুয়াসনেস এক বিরল অভিজ্ঞতা। মাছের ব্যাপারেও তাই, গোটা মাছ হলে সেই মৎস্য পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বংশ-মর্যাদা ও কৌলিন্য খুঁটিয়ে বিচার-বিবেচনার পর তবেই কেনা সাব্যস্ত হয়। এবং তারা গৃহে প্রবেশাধিকার পায় রসনা তৃপ্তির প্রয়োজনে। কত যত্ন নিয়ে সেগুলি কোমলভাবে স্পর্শ করে বুঝে নিতে হয়, তারা সব কেমন হবে! আর তারপর ধর, বাজারে ঢুকতেই, তখন তুমি কর্নেল বিশ্বাস রোডে, দোকানের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি বড় গেলাস তরল সোনা ঝরান আগুন জল পান করে, সাদা গোঁফ মুছে, ঠোঁট মুছে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা করতে বেশ মনযোগ হতে। সত্যি ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাজার গুছিয়ে নিয়ে পুনরায় ফিরতি পথের জন্য আরও এক গ্লাস নীরবে ধারণ করে তবেই ঘরে ফেরা যায়। আমিও ফিরেছি তোমার সঙ্গে এক আধদিন। তুমি তো নিমন্ত্রণ করেই খালাস, বছরের প্রথমদিন একটু আর্থিক প্রস্তুতি নিয়ে একেবারে সাতসকালে তোমার ডেরায় হানা দিলাম। গিয়ে কি হল জান? মীনাক্ষী দরজাটা চার ইঞ্চি ফাঁক করে ভ্রূকুটিসহ জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাইছেন? যথারীতি শক্তিকেই খুঁজছি একথা অকপটে কবুল করলাম। ইতিমধ্যে দরজার ফাঁকটুকু শীর্ণতর হচ্ছে বলে মনে হল। বেশ একটু অপদস্থ মত লাগছে। ভীষণ থমথমে গম্ভীর কঠিন মুখ মীনাক্ষীর। পৃথিবীর কিছু সম্বন্ধেই আগ্রহ

নেই, বিরক্তির শেষ সীমায় টগবগ করছেন। আমি তবু ছেলে মেয়ে বাবুই তাতার এরা ঘুম থেকে উঠেছে কিনা, শক্তি কি বাজারে চলে গেল, আজ আপনার অফিস ছুটি তো—এইসব অপ্রাসঙ্গিক কথায় আমতা আমতা করে সময় কাটাচ্ছি! এতটা কঠিন সময় কাটানর পর মীনাক্ষী সংক্ষিপ্ত জেরা করলেন, আপনাদের সঙ্গে ওর দেখা হয়নি? সামান্য এই কথাটুকু শুনতে পেয়ে যেন বল ভরসা পেলাম, বরফ তাহলে গলছে! মিথ্যা জানালাম, বেশ কদিন আগে দেখা হয়েছে, তখনই তো পয়লা বৈশাখ সকালে যাব, এমন কথা জানিয়েছিলাম, হয়তো ভুলেছে বেমালুম। থাক সে সব, খবর সব ভাল তো? আমি পরে বরং একদিন আসব, একটু কাজের কথাও আছে, এইসব কথা আমতা আমতা করে জানিয়ে বলে আসার কথা ভাবছি, হঠাৎ যেন শুনি রাতের কড়া নাড়া, মীনাক্ষী জানালেন স্বচ্ছভাবে সংক্ষেপ, শক্তি সাত দিন বাড়ি ফিরছে না। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় না? হয়, অবশ্যই হয়, কিন্তু সে কথা কি এখন বলা যাবে? বলা যায় না, শক্তির ক্ষতি করা যাবে না। মীনাক্ষীর দুশ্চিন্তা রাগ উচাটন সব দেখতে পেলেও, বুঝতে পেয়েও বলা যায়নি। এখন মীনাক্ষীর তেমন বড় দুশ্চিন্তা আর কিছু রইল না। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমিও শোকমগ্ন থাকব। গভীর সমবেদনা থাকবে আপনাদের জন্য। তবু আমাকে এমন মিথ্যা বলতেই হবে সত্যি কথার মতো। কাচুমাচু মুখে, বাড়ি না ফেরার কথা তো জানি না, শুনিনি, এইসব শব্দগুলি নিয়ে তোতলামি করতে করতে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলাম। শক্তির সঙ্গে আজ পয়লা বৈশাখ কোথায় দেখা হতে পারে ভাবতে ভাবতে চলে এলাম অন্য দিকে।

কটা দিন গেছে থিতিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু. আমি কিছু কিছু বেশি মনে রেখেছি. একথা বলার কোন মানে হয় না যে ওর শোক-স্তব্ধ শবযাত্রা ছিল পুলিশের শোক মিছিল। অনেকে ভালবাসতে শেখে না গোটা জীবনে, কবিকে সম্মান জানানর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। শরীরের কোন অভ্যাস বা আদতকে প্রেম বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, শুধু খুঁত খুঁজে ফেরে প্রতি ক্ষেত্রে বস্তুত তা যে ঈর্ষা থেকে উৎপন্ন এটা সকলেই বেশ বোঝে। আর সকলেই কি সকলের সম্বন্ধে কথা বলার বা সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা বা অধিকার রাখে? তার জন্যও কি শিক্ষা বা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না? এ সবই আমরা স্বচ্ছভাবে বুঝি। কিছু মানুষের নির্বুদ্ধিতা বা বুদ্ধিভ্রংশতা যখন পদলেহনের তৃপ্তি ও চমক খুঁজে ফেরে. সেগুলি অবজ্ঞা করাই শ্রেয়। এবং আমরা সেগুলি, সেই কথাগুলি ও মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করি ও তুচ্ছ কৃমিকীটের মত সরিয়ে রাখি। বোধহীন মূর্খদের চোয়ালে

থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারব পোঁদে। অতি সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কে মালিক কে সে রাজা!

না, শক্তিকে নিয়ে কারুর সঙ্গে ফালতু চটাচটির দিন এখন ফুরিয়েছে। এখন শক্তি তার নিজস্ব নির্মিত খাতে সুন্দর শরীরে অপ্রতিরোধ্যরূপে প্রবাহিত হবে, যেমন হয়েছে সর্বদাই। হতে থাকবে তেমনই। হারিয়ে যাবে কীটগুলি, ছোট মানুষগুলি। আমারও যে কদিন শরীরে কুলাবে, ওকে স্মরণ করার জন্য আহূত হলে শক্তিকেই কাছে পাব স্পষ্ট রূপে এবং নিজেদের বন্ধুভাগ্যে ধন্য মনে করব। তুষিব তোমারে এই সাধ নিয়ে তোমার কাজের কাছে থাকব।

শক্তি-সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেক কথা ভিড় করছে। পরে বলা যাবে। শুধু হাঁস যেমন জল বাদ দিয়ে দুধটুকু নিঃশেষে পান করে বলে একটা কথা আছে আপনারা তেমনি পূর্বে উক্ত এক গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদের রচনাকে নেবেন যেটুকু শক্তি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক হবে। আমি জলের মত পৃথক থাকব। বাকি অংশটুকু এই রকম ঃ "শক্তি গান ধরলে পৃথ্বীশও গান ধরে—শক্তির ওপরের পর্দায়, শক্তি থেমে যায়, 'এ কি গান হচ্ছে নাকি!' পৃথ্বীশের ফরমাইশ 'অই গানটা কর তো আজি রজনী যায়···!' দুজনের গলা এক একদিন একই পর্দায় চলে। অন্য সময় শক্তি 'দুলু, বেচারা!' আর পৃথ্বীশ—এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি! ওরা দুজনে দুজনকে কঠিনভাবে জড়ায়। পৃথ্বীশ জীবনকে ভালবাসে, বোধহয়, ভয়ংকর করুণ এক আর্তিতে। পৃথ্বীশ একেবারে ছ্যাঁচা-পোড়া, টলতে টলতে ভাঙতে ভাঙতে এখানে এসেছে। কি কারণে? কারণ তো নেই, কারণ তো নেই। যে মানুষটা এমন শক্তি তাকে খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে অনিবার্য পথশ্রমে ক্লান্ত দুজনেই যখন আশ্রয় ভিখারী—'আমাকে দাও কোল।'

মায়া মমতায় বড় বিচ্ছেদ জটিল

শুভ বসু

তাঁর বলার ধরন থেকেই তো কোনো কবি সম্পর্কে ধারণার আদল তৈরি হয় আমাদের মনে। কেউ বলেন খুঁজতে খুঁজতে, অতএব, সতর্ক পায়ে। তাঁর সেই অন্বিষ্টকে খুঁজতে খুঁজতে চিনে নেবার প্রক্রিয়ায় যে নিরন্তর রক্তক্ষরণ, তার বাকরূপ আমাদের অভিজ্ঞতাকে জীবনযাপনে আরো একটু প্রাণিত করে তোলে। কেউ বা আবার নিশ্চেতনের গুহান্ধকার থেকে সচেতনভাবেই আবেগে অধীর পদক্ষেপে ছুটে চলতে থাকেন চেতনার সমুদ্রের ধারণাতীত অনন্তের দিকে। তাঁদের সেই আবেগে অধীর ক্রমসঞ্চরণ আমাদের জীবনযাপনের দৈনন্দিনতায় নিয়ে আসে ছন্দের নন্দন। তারই দাক্ষিণ্যে আমাদের এই সামান্য জীবনযাপনেরও অন্বয় ঘটে যায় মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালে ব্যাপ্ত তারায় তারায়, নীহারিকা-মণ্ডলীর সঙ্গে!

সাধারণত এঁদের ফেলে-রাখা পদচিহ্নের একটি নির্দিষ্ট ক্রম খুঁজে পেতে পারি আমরা। সে-ক্রমটি থেকে বুঝে নিতে চাই ঠিক কখন কোন দিক অভীষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর, কখন সাময়িক বিভ্রান্তিতে তাঁর পদপাত ছিল স্খলিত, কখন জটিল কোনো সংকটক্ষণে চংক্রমিত হয়ে উঠেছিল গতিপথ, আর সমস্ত অন্বেষণ বিভ্রান্তি আর জটিলতার ভেতর দিয়ে তবুও কেমন নাছোড়ভাবে ছুঁতে চাইছিলেন তাঁর চরম অভীষ্টটিকে। গত বহু যুগ যাবৎ আমাদের প্রিয় কবিদের চিনে নেবার এই একটাই ছিল প্রক্রিয়া।

কখনো অবশ্য, শিল্পের ইতিহাসের জটিল কৌতুকেই হয়তো, আমাদের মুখোমুখি হতে হয় তেমন বিরল কোনো স্রষ্টার, যাঁকে চেনা আমাদের বহু যুগে অভ্যস্ত প্রক্রিয়াতে সম্ভব হয় না। এমন কোনো স্রষ্টার হয়তো চলার কোনো ক্রমই নির্দিষ্ট করা থাকে না, যে ক্রমটিকে চিনে চিনে আমরা তাঁর চলার আরোহী বা অবরোহী অভিজ্ঞতার স্বরূপটিকে চিনে নিতে পারি। হতে পারে, তুরীয়তাই এমন স্রষ্টার জীবনযাপনের প্রধান অবলম্বন।

এমন ক্ষেত্রে, গদামার-এর মন্তব্য উল্লেখ করে যেমন সাম্প্রতিক এক সাময়িক-পত্রের রচনায় অলোকরঞ্জন জানিয়েছেন, এই স্রষ্টার জীবনযাপনের তাৎক্ষণিক

সংরাগটিই সরাসরি সঞ্চারিত হয় আমাদের মনে। জীবনের সামগ্রিক বোধের পুরাণকল্প নয়, মননের দাক্ষিণ্য ব্যতীত যা পাঠকের গোচরাতীত থেকে যায়, বরঞ্চ প্রবল নিবিড় জীবনযাপনের নানা সংবেদনের আন্তরিক ছন্দোরূপ, যার বেদনা, সংরাগ, প্রেম ও মমতা ব্যাপক পাঠকের মনকে সহজেই আচ্ছন্ন করে দেয়। তাকে মনে হতে থাকে অপ্রতিরোধ্য। স্বভাবতই ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়ে ওঠেন সেই স্রষ্টা।

তাঁর কাব্যচর্চার একেবারে প্রথমদিকে 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' কাব্যগ্রন্থে 'হলুদবাড়ি' কবিতায় যখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বলতে শুনি ঃ

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্ত্রির
হলুদবাড়ি—যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।
হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থ কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি।

তখন, অন্তত শেষ যুগ্মকটিকে লক্ষ্য করে কারো কারো মনে হতে পারত; এই তো আমাদের পরিচিত অনুসন্ধানের চেহারা। পরিচিত নির্দিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসায় তিনিও তেমন উদাসীন নন তাহলে।

তা যে হয় না, তার কারণ পাঠকেরা তার আগেই বুঝে গেছেন আবেগ ও অনুভূতির তুরীয়তায় বিচরণকারী এই কবির মানসজগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি নিরন্তর হৃদয় দিয়েই ছুঁয়ে থাকতে চান রক্তমাংসের কণ্টক কর্দমকে আর নিরন্তর যন্ত্রণায়, আর্তনাদে রক্তক্ষরণে এবং এসবের ভেতরও গভীর মমতায় সেই স্পন্দনময় রক্তকর্দমকেই ছুঁয়ে থেকে রচনা করে চলেন বিস্ফোরণময় শব্দের স্রোত!

জীবনকে তাঁর এই রক্তমাংসময় স্পর্শেয় সংরাগ মুহূর্তে কেমন অবশ করে দিতে পারে, পাঠক তা টের পেয়ে গিয়েছিলেন সেই পঞ্চাশের দশকে, তাঁর আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঃ

আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো ও ভয়াল দেহ
সমস্ত কাপড়সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো সংক্রাম
চুলের।
কী করবে তুমি, অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম
ক্ষেতের সীমায় পড়ে, বালুকায় রেখে শান্ত মাথা ?

* * *

ভুলে যাবো একদিন, এ কথার স্পর্ধা থাকে থাক
ভুলে যেতে হয় যদি তোমাকেও, হে ডুবো শরীর
চাড়া দিও বুকে, নখে দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর
উদোম সড়ক, পারো চলে যেও ক্রূর হাত ধ'রে।
কী তবু কামনা বাকি, আজো কেন তৃষ্ণা নাহি সরে—
কিছুতেই,
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

কামনার এই তীব্রতা ও বিচ্ছেদবোধের অনিবার্যতাই যে এই কবিচেতনার অন্যতম প্রধান দ্বান্দ্বিকতা এই বোধের সত্যে পাঠক সম্ভবত পৌঁছোতে পেরেছিলেন 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যের' আমল থেকেই।

এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর অমল উচ্চারণের নিষ্ঠায় কী প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল কয়েক দশক আগে, স্পষ্ট মনে পড়ে ঃ

মনে পড়ল তোমায় পড়ল মনে
বাঁশি বাজল হঠাৎই জংশনে
লেভেল ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছ কি হার্ট ক্রেন ?
('মনে পড়লো')

কিংবা কী মর্মান্তিক বিঁধেছিল পাঠকের অন্তরে ঃ

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?
অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?
('চাবি,' 'ধর্মেছো আফে নিরাতেও আছো')

তাঁর লিরিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ এমনি আরো বহু পংক্তিই তো তখন পাঠককে জেরবার করেছে নাছোড় ঃ

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্যোপায়—দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।

('স্থায়ী,' 'ধর্মেও আছো জিরাকেও আছো')

অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ-বেদনার উচ্চারণ ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে। ষাটের দশকের শুরুতেই যে তার এই বেদনার লিরিক আবেগ বেছে নিল গাঢ়তর ভাষাভঙ্গি, তাও তাঁর কবিত্বের জঙ্গমতার এক চমৎকার প্রমাণ ঃ

সমুদ্রতীরে পৌঁছই পাহাড়পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধ হয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র পাহাড় একাকার
একেকদিন তোমার কাছ থেকে দূরে যাই দূরে থেকেও কাছে
এমন শক্ত কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই
নই ইলুস্থুলু প্রকৃতি, বনভোজন কিংবা ইয়ার দোস্তে
যেখানেই যাই—তুমি আছো, এঁটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে
রক্ত-পিপাসু জোঁকের মতন
আবছা আলোর ভিতরে কেরোসিনের ফিতের মতন আঠায় ভিজে
আছো যেমন ধুলোর ভিতর জীবাণু থাকে, জীবাণুর ভিতর প্রাণ
একেকদিন তোমার কাছ থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শক্ত কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই। ('একদা এক আমি,' 'সোনার মাছি খুন করেছি')

অবশ্য, এ তাবৎ উদাহরণগুলি থেকে এমন ধারণাও হতে পারে কারো কারো—এতো নেহাৎই এক ব্যর্থ প্রেমিকের স্বগতোক্তি—যেমন পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকে হাজার হাজার বঙ্গতরুণের মুখে শোনা যেত আকছার—একটু বেশি, কবিত্বময় হয়তো, এই যা। কিন্তু তেমন সরল সিদ্ধান্ত যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অন্তত অপ্রযোজ্য তা মানতে হবে তাঁকে, যিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে স্পন্দনময় রক্ত মাংসে কবির আসক্তির স্বরূপ সন্ধানে উদ্যমশীল। যাঁর উচ্চারণের আন্তরিকতায় কপটতা কখনোই প্রশ্রয় পায় না, তাঁর ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছেঁদো

উদাসীন দেবদাস-শোভন প্রচলিত হাহুতাশের ন্যাকামির পরিবর্তে তাঁর প্রজন্মের প্রেমের আবেগের সাধারণ লক্ষণ নির্মম সর্বগ্রাসিতা—কোনো নান্দনিক দার্শনিক প্রস্থানের সাহচর্যে যার তীব্র আকুতি শমিত হয় না ঃ

'সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজানো গাছের ছালে
ছড়িয়ে ছিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টু বীজ
ক্ষেত ভরে যার শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো ? / কারণ আছে ? তালসুপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো—কারণ আছে।

*　　*　　*

এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ব্যেপে—
আপাদশাখা সারা শরীর—তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম
সর্বনাশা বিষের জাদু লুঠ করে হাড় ভাঙতে বাকি
ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে
বসিয়ে রাখে সারাজীবন—

অর্থাৎ, এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের কবি তো বলেনই না ঃ

মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই।

এমন কি দুদণ্ড শান্তির কথা বলেও অশ্বস্ত হতে চান না। তাঁর ভালোবাসাকে তিনি রক্তেমাংসে ছুঁয়ে থাকতে চান আজীবন।

এতো সেই পঞ্চাশের দশকের কথা, তাঁর রীতিমত তারুণ্যের, আড্ডায় ইয়ার্কিতে তাঁর নিজের ভাষায় 'যৌবনের'-কাল। সেখান থেকেই তুরীয় মার্গে তাঁর যে চলার শুরু. পরবর্তী বহু দশক জুড়েই সেই চলার ভরকেন্দ্র হয়ে রইল সর্বগ্রাসী আসক্তির পরিণামে অনিবার্য বিচ্ছেদব্যথার দ্বান্দ্বিকতার ট্র্যাজিক আর্তনাদ।

অথচ এ-ট্র্যাজেডি যাঁর, তিনি যেহেতু আধুনিক, তাই তাঁর আর্তির ভাষা হয়ে উঠল. জটিল এবং নানা প্রসঙ্গের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় কখনো কখনো প্রায় আমাদের পরিচিত দেহতত্ত্বের গানের মত আদ্যন্ত রহস্যময়। এই রহস্যজটিল আর্তিময় ট্র্যাজিক বিস্ফোরণ তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে আরো মাত্রাময় হয়ে ওঠে।

তাঁর কাব্যচর্চার ষাটের দশকের শেষ পর্বে এমন অনেক উদাহরণ আমাদের চৈতন্যকে আবেশে অবশ করে দেবার শক্তি ধরত ঃ

"বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো—সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজ কর্মে ভুলচুক আবার আমার তেমন পছন্দ হয় না
আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা
মায়া—'

('আজ আমি', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

গ্রন্থটির প্রথম কবিতাটির শেষ এই কয়েক পংক্তিতে যে বিষন্নতাবোধ. সমস্ত কবিতাটির শরীর জুড়ে, তার পশ্চাৎপট হিসেবে চারিয়ে থাকে গভীর মমতাবোধ, ভালোবাসা। বিচ্ছেদবোধের চরম অনিবার্যতা ও আর্তি সত্ত্বেও এই কবি কখনো প্রেমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না ঃ

'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদীসমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।'

('একবার তুমি,' 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

আবার এই মমতার কোল থেকে উঠে আসে সেই বিচ্ছেদবেদনা, যার অনিবার্য ট্র্যাজিক আর্তিকে কবি চিনে নিতে থাকেন অস্তিত্বেরই অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ঃ

হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় শ্লেটে রাসতলায়
নদী সমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে ডালে টকি হাউসে
হারিয়ে এসেছি ইস্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে-গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে—
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি—ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর

কখনো ফিরে পাবো না সেই সব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার দিন
ফিরে পাবো না আর

('আমরা সকলেই,' 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

অথচ ভালোবাসার মায়ায় মাখা এই সরল অনুভবের ছাঁদটি এর ঠিক পরে পরেই আবার চুরমার করে দেন এক অস্থির জটিলতায়—যা সম্ভব হয়তো ওই রক্তক্ষরণময় তমোলীন প্রজন্মেরই মনে ঃ

'ভালোবাসা মানে এক হিম
অন্ধকার খুঁজে নিয়ে পুঁতে ফেলা অশ্লীল ডালিম'

('তুচ্ছ, তুচ্ছ এইসব' 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

প্রেম আর অনিবার্য বিদায়ব্যথার টানাপোড়েনে পৃথিবীর মানবজীবনের প্রতি অপার মমতায় সম্ভবত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল নিরন্তর ভবঘুরের জীবন। কোনো দার্শনিকতায় নয় অবশ্য, জীবনের সংরাগের অনুভবেই তাঁর অনিবার্য মনে হয়েছিল 'আমাদের ঘর নাই আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে' ('তিন তরঙ্গ')।

তাঁবুতে বসবাস যাঁর, তাঁকে তো জনজীবনের সঙ্গে ওঠাবসা করতেই হয়। আর তাঁর কবিতা তখন কুড়িয়ে নিতে থাকে জনজীবনের নানা ছবি, খুব সচেতন দার্শনিক সমগ্রতা সন্ধানের সুবাদে নয় হয়তো, তবে জীবনের সংরাগের স্পন্দনের সোঁদা গন্ধে মাতাল করা ঃ

'পথের দুপাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট নড়ন চড়ন ঠকাস
তাই, পরের কানে ফুসমন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর—
এমন কি ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না'

কিম্বা এই একই কবিতায়, আর একটু পরে—

'চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদ্দি খলিল
যে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কান্ত, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগু পিছু—একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে

এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকেও চাচ্ছি
('দেখি, কে হারে', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই যে চকদীঘি আর নেয়েপাড়ার সামান্য জীবননাট্যকণিকা আমাদের মনে নিয়ে এলো জবরদস্ত আলোড়ন, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো তাঁর শব্দব্যবহারের লোকায়ত অনন্যতায়।

এই শব্দ প্রয়োগের শক্তিমত্তাই তাঁর কবিতার আক্রামক শক্তির প্রধান অবলম্বন। সম্ভবত নিজেও সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন তিনি। বেশ মনে আছে, আড়াই দশক আগে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি স্রেফ প্রলয়ঙ্কর শব্দব্যবহারের বিস্ময়কর ক্ষমতায় কবিতার পাঠকমাত্রকেই কেমন বিহ্বল করে তুলেছিল ঃ

'পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে—ফ্যানজোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত—
হেন্ করেঙ্গা তেন্ করেঙ্গা।

শব্দ ব্যবহারের এমন স্বেচ্ছাচার যে কাকতালীয় নয়, বরং কবির সচেতন নিরীক্ষার প্রমাণ সে কথা কবুল করা ছিল এই কবিতাটির ভেতর ঃ

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তারা পরাতে—আরেক কথা, হোহেনজোলার্ন—
মনে পড়লে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয়, নাকি মুদ্দফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ন—
এই মিলেতেই পদ্য মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো স্যাকসন হাড় ছিঁড়ে এক টুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিট মদ্যে আঁচাতেন
ভোজ্যদ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল একবাটি সুক্তো ॥
('পোকায় কাটা কাগজপত্র' 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

অর্থাৎ, এই কবি তুরীয়তে বাঁচতে বাঁচতে স্বাভাবিক প্রতিভায় শব্দের বিস্ফোরণে নিরন্তর কাঁপিয়ে গিয়েছেন তাঁর কবিতার সাম্রাজ্যকে আজীবন। অবশ্যই, জীবনকে ভালোবেসে, পরিণামে অনিবার্য ট্র্যাজিক রক্তক্ষরণের যন্ত্রণাকে অনুভবের দায় স্বীকার করে। হয়তো, উচ্চারণে তেমন অর্থময় হয়ে ওঠার চেয়ে, আমাদের আমূল ঝঙ্কৃত করে দেয়ার ভেতরে তাঁর আনন্দ বেশি ছিল।

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে, তেমন অর্থময় পারিপার্শ্ব চেতনা নাড়া দিত তাঁকে, সেখানেও তিনি কেমন অবিস্মরণীয় —ঃ

আলোচ্য গ্রন্থের 'পরশুরাম' কবিতাটি তার অমল সাক্ষ্য বহন করে ঃ

'অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমরা পা টিপেটিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোস
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।'

তার পরের দশটি পংক্তিতে হিংস্র প্রস্তুতির নিখুঁত বর্ণনার পর ঃ

"তারপর পা টিপেটিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়—
জমজমাট অন্ধকারে, অলি-গলি ঘরবার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে ক্ষত্রিয় হয়েও
আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে।'

আমাদের বিগত কয়েক দশকের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এমন ধারাভাষ্য হয়তো তাঁর হাতে ব্যতিক্রমী, কিন্তু বিরল সার্থকতায় মন্ডিত।

তেমনি ব্যতিক্রমী হয়েও স্মরণীয়তায় মণ্ডিত হয়ে থাকে 'বড়োমানুষ কেবল তাকে'র মত কবিতা। ভারতবর্ষময় ক্রমাগত উচ্চবর্ণের বর্বরদের হাতে নিম্নবর্ণের ঘর পোড়ার অভিজ্ঞতায় আধারিত কবিতাটি উচ্চারণের আন্তরিকতা ও বেদনার নিষ্ঠায় হয়তো অনেক তথাকথিত কমিটেড কবিকে লজ্জা দেবে ঃ

'ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে
সে পোড়া মুখ দেখতে পারছে না
থাকে আঁধার, আড়ালে আবডালে
ডাকাত হয়ে তবুতো কাড়ছে না
ঘর যেন তার না জ্বালে বর্বরে'

কখনো কখনো অবশ্য, হয়তো জীবনের প্রতি বিপুল সংরাগ-বশতই, সংহত অর্থময় উচ্চারণ ভর করত তাঁকে। তেমন উচ্চারণ অনিবার্যতারই গুণে হয়ে উঠত মন্ত্রের মতন। সংহতিতে, অর্থময়তায় ঃ

ডালপালা কেটে আমি রাখি এ-জীবন
মালির অত্যন্ত প্রয়োজন
মালির একান্ত প্রয়োজন

কাঁটাগাছে

কেবল জীবনই ভরে আছে
অন্য কিছু নয়
অন্য কিছু হলে পরে জীবনের হতো পরাজয়
শুধু থেকে থেকে
যে উৎফুল্ল শাখা গেছে বেঁকে
তাকে কর সংযত শরীরে
অটল যেমন চাঁদ জেগে থাকে মেঘেদের ভিড়ে ॥
('ডালপালা কেটে', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

ষাটের দশকের দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে এই সমস্ত লেখা আজও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক বলে বোধ হয়। অবশ্য এই একই গ্রন্থে জায়গা করে নিয়েছিলো 'বেশ কিছু কবিতা' কবির, ভাষায়, যাদের 'মোটামুটি লেখার সময় ১৯৫৫-৫৮।' এদের ভেতর ছিলো চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ এবং দুটি দীর্ঘ কবিতা—'কথোপ-কথন' ও 'সেই রাক্ষসী'।

উল্লেখ থাকা ভালো, এক্ষেত্রে 'চতুর্দশপদী কবিতা' অর্থ সনেট নয়—গড়ন এবং প্রকৃতি উভয়তই। অথচ তাঁর গীতিপ্রবণতাকে অদ্ভুত সংহতি দিতে পেরেছিলো চৌদ্দটি পংক্তির নির্দিষ্টতা ঃ

'উড়াও উড়াও নোয়া পাখি।
ফিরবে না কখনো যেন মাটি জাগে জলের ভিতরে।
আমার বিষণ্ণ ঢাকে স্তব্ধতাকে, অনায়াস শত
আজীবন জেগে আছি ; শূন্যে ঝোলে অগ্নিপিন্ড দীর্ঘ
সমুদ্র গুল্মের কাঁটা বিক্ষত করেছে পদযুগ।'
(চতুর্দশপদী ৫, পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি),

বেদনাজর্জর এই গীতিময় সংহতি কোথাও কোথাও প্রায় স্তবের কথা মনে পড়িয়ে দেয় আমাদের ঃ

আর কোনোদিন আমি তোমায় ডাকবো না এইভাবে
আজকের মতন আর কোনোদিন নৈরাশার ভারে
মুখ থুবড়ে পড়বো না ; কোনোদিন কোনোদিন আর
তোমায় ডাকবো না আমি এইভাবে হৃদয়েশ্বরী।
(চতুর্দশপদী '৬', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি')

অবশ্য, নতুন করে বিস্মিত হতে হয় এই গ্রন্থের 'কথোপকথন' আর 'সেই রাক্ষসী' দীর্ঘ কবিতা দুটির কথা ভাবলে। কবির হিসাবমতো এরা যদি সত্যিই 'যখন পদ্য লেখা শুরু' করেন 'তারই কাছাকাছি সময়ের' হয়, তাহলে বলতে হবে তিনিও বিরল সেই স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টিকর্মের আরম্ভেই নিজের পরবর্তী জীবনব্যাপী সৃষ্টিচর্চার মূল দ্বান্দিক সূত্রটিকে চিনতে পেরেছিলেন।

'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' কাব্যগ্রন্থ-কেন্দ্রিক আলোচনা।

কালোমাটিতে বন্ধু-র পদচ্ছাপ

অমরেশ বিশ্বাস

একজন থেকে আরেকজনের মুখে মুখে যা অনায়াসে ফিরে বেড়ায় এমন কবিতা বোধ হয় বেশিই লিখেছে শক্তি। বুঝে এমন কি না বুঝেও শক্তির বেশ কয়েক ছত্র আওড়াতে দেখেছি একেবারে গাঁইয়া এবং সেই অর্থে আনপড় লোককেও। এবিষয়ে শক্তির জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। সেই শক্তি নেই। আচম্বিতে চলে গেল। ও লিখে গেছে,—'কবি যদি দুঃখ পায়, কলকাতাও দুঃখ পেতে থাকে।' আর কবি চলে গেলে কলকাতা তো বটেই তার সঙ্গে গোটা মফস্বল দুঃখ রাখার জায়গা পাচ্ছে না, পাবে না। আসানসোলের খনি অঞ্চলও চোয়ালে থাপ্পড় খেয়ে বসে আছে নিঃঝুম।

কবিতার (শক্তির ভাষায় 'পদ্য') ঝুলি ভর্তি করতে ওর পায়ের ছাপ পড়েনি এমন গাঁ-গঞ্জ, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্দুর কি নদীর ধারের নাম করা বড় মুশকিল। যেখানে ও গিয়েছে ওর মতো করে নিংড়ে নিয়েছে সেখানকার সব কিছু। তারপর চালান করে দিয়েছে কবিতায় ওর নিজস্ব ঢঙে। আর সেই ঢঙকে একান্ত নিজের মতো করে পাওয়া গেল ভেবে কবিতাপাগল মানুষ শ্বাস নেয়ার মতোই বুকে নিয়েছে টেনে। এই খনি অঞ্চলেও শক্তি এসেছে। আমন্ত্রণে, অনেকসময় বিনা আমন্ত্রণেও। ও তো গাইত। রবীন্দ্রনাথের গান— 'ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাবো না। ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি ?' এ ওর প্রাণের কথা। মাঝে মাঝেই কলকাতাকে কানা করে দিয়ে-ও বেরিয়ে পড়ত ঝাড়া হাত-পা। শক্তির গলায় বা মনে তখন সেই গান,—'শূন্য হাতে ফিরি হে…'

সেই কবে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় সিগনেটে নতুনভাবে সাজানো বইয়ের গন্ধে …এক সহপাঠীর বন্ধু হিসেবে শক্তির সঙ্গে আলাপ। ও তখন কবি …ত্যিকারের 'স্বেচ্ছাচারী'। তখনকার দিনে মাঝে মধ্যে …কলেজের ১নং গেটের বটতলায় আড্ডা, চা আর চারমিনার …শ)। বেশ কিছু পরে মার্কাস স্কোয়ারের 'আর্ট ফেয়ার'-এ

তারও অনেক পরে 'ভারবি'তে কবিতা সাপ্তাহিকীর আমলেও কয়েকবার দেখা। মাঝে কয়েক বছর ফেড্ আউট।

অনেক বছর পরই বলতে গেলে—আসানসোলের 'রাঢ়পত্র' আয়োজিত এক সম্মেলনে ওকে দেখি। তখন ও রীতিমতো স্টার কবি। ২০।২২ খানা বই বেরিয়ে গেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই এ অঞ্চলেও অনেকের ঘরে 'সঞ্চয়িতা'—'সঞ্চিতা'র পাশাপাশি। তো শক্তি এখানকার সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত লেখক-কবিকুলের একজন। টিকিট কেটে এমনকি বরাকর দুর্গাপুর থেকেও লোকজন এসেছে নামী কবি-লেখকদের দেখতে এবং শুনতেও। অথচ আসেননি প্রায় কেউই। অনামী কয়েকজন লেখক-কবিকে নিয়েই আসতে বাধ্য হয়েছেন দেবুদা (দেবকুমার বসু)। নামীদের মধ্যে শক্তি। মঞ্চের পাশে আমাকে দেখে সেই যে শক্তি আমার হাত ধরে জোর করে মঞ্চে তুললো, সারাক্ষণ আমাকে ছাড়েনি। অনেককে দেখার প্রত্যাশা না মেটায় শ্রোতাদের হৈ হল্লা চলছে বেশ। চিরকালের ডাকাবুকো শক্তি যেন থতমত। কোনোরকমে সে রাতটুকু আয়োজকদের ব্যবস্থাপনায় সার্কিট হাউসে কাটিয়ে সবাইকে নিয়ে দিশেরগড়ে গেলাম আমার বাসায় শক্তি আর দেবুদার ইচ্ছেয়। এবারে অবশ্য ও শূন্যহাতে আসেনি —হাতে ধরা ওর একরত্তি ছেলে 'তাতার'।

একবেলা কাটিয়ে বিকেলের ট্রেন ধরে সবাই ফিরল। শক্তি থেকে গেল। দেবুদা একবুক দুশ্চিন্তা নিয়ে গেলেন তাতারকে রেখে যেতে হল বলে। ও বলল —দেবুদা, মীনাক্ষীকে বলে দিও অমরেশের বাড়ি আছি। টানা চারদিন তাতারও রয়ে গেল ঝাঁকের মোরলা হয়ে। আর এই ফাঁকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফাটল ঝালিয়ে দিয়ে গেল ওর তপ্ত ভালবাসা।

প্রায় দুই যুগেরও আগে চেনা কোনো বন্ধুকে এমনিভাবেই একান্ত আপন করে ভাবতে দ্বিতীয়বার ভাবার দরকার হত না ওর।

তারপর থেকে এই খনি অঞ্চল, দামোদর-বরাকর-খুদিয়া বিধৌত গাঙ্টিকুলির বালিয়াড়ি হয়ে উঠেছিল ওর ভালোবাসার একটানা জ্বরে আক্রান্ত। এসেছে সপরিবারে,—কালেভদ্রে একা, কখনো অন্যান্যসঙ্গী সঙ্গে কেউ কেউ। বেশির ভাগ সময়েই থাকত অমিতাভ দাশগুপ্ত। ওর এই আসা দেখে আশায় বুক বেঁধেছে এখানকার লিটল ম্যাগাজিনের ছেলেপুলেরা, কবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা, বইমেলার কর্মকর্তারা। কলকাতার বুকে বসে কথা দিয়েও যে কিনা অনেক জায়গায় গিয়ে উঠতে পারে না, অনুষ্ঠানের দিনে ওর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায় কোলাঘাট বা

বেথুয়াডহরীতে চলে গেছে বা কার বৈঠকখানা আলো করে গান জুড়েছে কলকাতায় নিজেই তা জানে না—সেই শক্তি কিন্তু এ অঞ্চলের ডাকে পা বাড়িয়ে বসে থাকত। যতদূর মনে পড়ে, করদা (ধীরেন্দ্রনাথ কর) আয়োজিত ই. সি. এল-এর পত্রিকা 'মুদঙ্গার'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের দিনে (১৯৮২?) শক্তি আসতে পারেনি। তবে 'তোমরা দেখো' নামের একটি পদ্য (এটি কোনো গ্রন্থে চোখে পড়েনি) পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই না আসতে পারায় করদার কাছে যেভাবে পরবর্তীকালে লজ্জা প্রকাশ করেছে তা শক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিশাল শরীরের আলিঙ্গনে করদাও দিয়েছেন ওর প্রাপ্য সম্মান। এ ছাড়া প্রায় সব ডাকেই ওকে পেয়ে গেছে এ অঞ্চল। ওর তো পায়ের তলায় সরষে—বেড়াতেও এসেছে এদিকে। মনে পড়ে ধুন্ধুমার বৃষ্টি তুচ্ছ করে অথবা ঠা ঠা রোদ্দুরে স্নান করে কতদিনই তো আমরা হেঁটে গেছি কয়লার শেল বাঁধানো রাস্তায়, দামোদরের শুকনো বুকে, পীরদরগার পেছনে তেঁতুল-শিশু-গরানের শেকড়-বাকড়ের মাঝে ঢালু রাস্তা বেয়ে। কখনও গাড়িতে ধুলো উড়িয়ে শীতলপুরের গেস্ট-হাউসে, কখনও বা কল্যাণেশ্বরী-মাইথনের পাহাড়ের কোলে। তখন পাশে-বসা চেনা-শক্তি অচেনা। দুচোখ ভরে দেখেছে প্রকৃতি। 'শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য'—ওর এই লেখার অর্থ তখন ওর মুখে-চোখে। বেলা বয়ে যাবার কথা মনে করিয়ে ফিরতে চাইলে বলতো—'কী এমন হয়েছে আরও একটু চলো না।' মনে যা বিশ্বাস করতো তাই লিখেছে সারাজীবন। ঐসব মুহূর্তে ওরই লাইন মনে হত খুব—'যাবেই যদি ঘন ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন?' কেননা—'ফিরতে আনন্দ নয়, যেতেই আনন্দ।'

আকাদেমি পাওয়ার পর এক বিকেলে ওর বেকবাগানের বাসায় আমাকে ধন্য করে দিয়ে নিজে থেকেই বললো—'এবার একবার তোমাদের ওখানে ঘুরে আসা যাক।' মীনাক্ষীও এককথায় রাজি। স্থির হল—শক্তি এবং অমিতাভ বৌ-বাচ্চা সমেত যাবে। তার আগে শিশিরমঞ্চে 'আবৃত্তিলোক'-এর সংবর্ধন সভা আছে। যতদূর মনে পড়ে ২২ জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে শেষরাতের ট্রেন ধরে বৌ-বাচ্চা সমেত যেতে বাধ্য হয়েছিলাম শক্তির ইচ্ছেয়। পরের মাসে নির্দিষ্ট দিনে সব্বাই হাজির দিশেরগড়ে। সঙ্গে আরও তিন বন্ধু অথচ বিটু (শম্ভুলাল বসাক) কোনো কারণে আসতে পারেনি; শক্তির সান্ধ্য বৈঠকের প্রায় নিত্যসঙ্গী সে আমারও পুরোনো বন্ধু। ওর উপস্থিতিতে শক্তি খোলে ভালো। অবশ্য জম্পেশ আড্ডা দিতে শক্তির কোনোকালেই বাছাই-অবাছাইয়ের বালাই ছিল না—বিশেষ

অমিতাভ আর শক্তি দুজনেই দুশো। আসানসোল-কুলটি-বরাকর-বার্ণপুর-দিশেরগড় অঞ্চলের অনেককে স্কুলের হলঘরের পেটে পুরে বিকেল থেকে সন্ধে খুশিতে ডগমগ করে রাখা গেল। অমিতাভ তো হলভর্তি সবাইকে জানালো—শক্তির আকাদেমি পাওয়া আমাদের বন্ধুদের সকলেরই পাওয়া। সেবার তিনদিন তিনরাত্তির স্ফূর্তির সমুদ্রে হাবুডুবু।

রোজ সন্ধেয় বসেছে কবিতাপাঠের আসর। সন্ধে ঘন হলে—'আমরা একটু ঘুরে আসছি'—বলে বেরিয়ে যখন নাতিদূরের বস্তি থেকে ভেসে এসেছে মাদলের দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হাঁড়িয়া মোচ্ছব শেষে মালকাটারা (খাদানে কয়লা কাটে যারা) যখন টালমাটাল পায়ে ঠিক রাস্তা খোঁজায় ইতিউতি,—শক্তির সঙ্গে অমিতাভর শলাপরামর্শ তখন চরমে। কিন্তু না,—কোনো তরল আগুনেই কবিতার বিচ্যুতি ঘটেনি কণ্ঠ থেকে। শক্তির শান্ত অথচ দৃঢ়কঠিন নিটোল কণ্ঠস্বর যেমন থাকতো নিবিষ্টপাঠে তেমনই সরব চিৎকৃত পাঠে 'আমি স্বেচ্ছাচারী' বা 'অবনী বাড়ি আছো' হতো ততোধিক মুগ্ধকারী। শক্তি শুরু করতে না করতেই ধরে অমিতাভ। শেষ পর্যন্ত দুজনেই একসঙ্গে শেষ করে। কবিতা শক্তির লেখা, অথচ তা অমিতাভর কণ্ঠস্থ মায় দাঁড়ি-কমা শুদ্ধু। যত রাত বাড়ে তত তাল বদলায়। শুরু হয় গান। অমন উদাত্ত কণ্ঠের গান না শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এবারে পরাস্ত দুজনেই। গানের লাইন দুজনেই ভুলে গেলে ধরিয়ে দেয় মীনাক্ষী।

শীতের রাতে একখানা রুমাল-সাইজের ঘরে ২০।২৫ জন (আশপাশেরও কয়েকজন) মিলে এই পারিবারিক আনন্দের ভোজে মধ্যমণি অবশ্যই শক্তি। আহ্ এখন বড্ডো মনে পড়ছে শক্তিশোভিত সেই সন্ধেগুলোর কথা। মনে পড়ছে ঐসব সন্ধেতেই ওর গান—'আর কি কখনও কবে এমনও সন্ধ্যা হবে…'

আমার পরিচয় দিতে গিয়ে ও যখন বলতো—'খুব পুরোনো বন্ধু' তখন 'খুব' শব্দটায় আত্মশ্লাঘা বোধ করেছি। অতি গভীরভাবে মিশেছি শক্তির সঙ্গে কিন্তু ওর সম্বন্ধে গুছিয়ে কিছু লেখা অসম্ভবপ্রায়। হঠাৎ নিজের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হয়ে গেলে সে বেদনার প্রকাশ হয় কি? ওর চলে যাওয়ার মতো ভূকম্পনে ধ্বংসস্তূপ হয়ে বসে আছি কিন্তু স্মৃতির পাহাড় বেঁকেচুরে যায়নি,—বুকে চেপে বসে আছে।

আমাদের দিশেরগড়ের বাসায় যেমন তেমনি কখনও শীতলপুরের গেস্টহাউসে কখনও বা কিলবার্ণের গেস্ট-হাউসে। এই তো সেদিন (বোধ করি ১৯৯১),

মৃদঙ্গার সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্য বাসর ও কবি সম্মেলনে শক্তির সঙ্গে এসেছিল প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী—অমিতাভ তো ছিলই। সারাদিন দিশেরগড় ক্লাবে নন্দদুলাল আচার্য চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ব্যস্ত ছিলেন অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সার্থক করতে। ছবি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে একটু তেতে উঠেছিল সভাস্থল। কিন্তু নাটক যত না মঞ্চে তার চেয়ে বেশি জমে গ্রীনরুমে। সন্ধেয় গেস্ট হাউসে ফিরে ফাটাফাটি আলোচনা। শক্তি এসব সময়ে এক ধরনের শব্দহীন হাসি হাসতো, বসে থাকতো জ্বলন্ত সিগারেট হাতে, সামনে অবশ্যই পানীয়—সেদিনও তাই। হঠাৎ সকলের চেঁচামেচি ছাপিয়ে 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ···' গেয়ে উঠলো। তারপর শুধু গান আর গান। এরকমই দেখেছি ওকে। কখনও নিজেকে কোনো ক্ষেত্রে কলহে বা কুৎসায় জড়াতে চায়নি। কোনো নীচতা বা ক্ষুদ্রতা ওকে ছুঁতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। খুব বড় মাপের নিন্দার যোগ্য কেউ কিছু করলে—'ছোটোলোক', 'উল্লুক', 'একেবারেই নষ্ট'—এই ছিল ওর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া। আবার সে লোকের সঙ্গে দেখা হতেই—'কি? ভালো আছো তো? খবর কি?'—মায় পারিবারিক খবরও ওর নেয়া চাই। শক্তির যেমন ছিল ভালোবাসার ক্ষমতা স্মৃতিশক্তি ছিল বোধ করি তার চেয়েও বেশি। আসানসোল বইমেলায় দেখেছি মাত্র এক-দুবার দেখা ছেলেপুলেকেও কি অবলীলায় সে নাম ধরে ডেকেছে। অসমবয়সী কনিষ্ঠরা ওকে 'শক্তিদা' বললেও কখনোই সেই সম্ভ্রমজাগানো দূরত্ব থাকতো না—এ ব্যাপারে শক্তির কৃতিত্বই অধিক। মেলা-মেশায় এতই অকৃত্রিম এবং ঘনিষ্ঠ ছিল ও অঞ্চলের সকলের কাছে। বোধ করি পরিচিত মহলের সর্বত্রই।

সৌভাগ্য আমার—এই শিল্পাঞ্চলে কোনো অনুষ্ঠানে ওকে আসতে অনুরোধ জানাতে গেলে ও তাদের বলতো—'অনুষ্ঠান শেষে আমাকে অমরেশের বাসায় পৌঁছে দিও।' কখনও বলে পাঠাতো—'ও যেন স্টেশনে থাকে নইলে আমার অসুবিধে।' অসুবিধে যে কী তা আজও বোধগম্য নয় আমার। যতদূর জানি, আদর-আপ্যায়ন পান-ভোজনের পরিপাটি ব্যবস্থা সর্বত্রই থাকতো ত্রুটিহীন, তবুও···। ঐ তবুও কেবল ওরই জানার কথা। আসানসোল বইমেলায় এসে একবার হি হি শীতে আমাকে আর নন্দকেও হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল মেলা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় আসানসোল ক্লাবে—অতি ভোরবেলার ট্রেনে কলকাতা ফিরবে তাই। সে রাতে রত্না (অমিতাভর স্ত্রী) অমিতাভ বা আমরা কেউই ঘুমুতে পারিনি। জলপাইগুড়ির নস্টালজিয়ায় আর গৌরীহাটের গল্পে আমর

সকলেই সেই রাতে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিলাম। ওর চলন, বলন, কবিতা, গান বরাবরই ওর শাদা (প্রকৃতপক্ষে হলুদ গরদ রঙের) চুল আর গোঁফকে পরাস্ত করেছে। আসানসোল ক্লাবের সেই রাত তার সাক্ষ্য দেবে।

আর একবার এখানের বইমেলায় আয়ান রশিদের সঙ্গে কবিতামাঠ যুগ্মভাবে। উর্দু রশিদ খানের বাংলা অনুবাদে শক্তি। আমার সঙ্গে বাসায় যাবে বলে মঞ্চে উঠল। আমি বসে আছি তো আছিই। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ দুজনকে বগলদাবা করে কখন যে নিয়ে গেল জানা নেই। পরদিন সকালেই হাজির। নির্বিকার। হাস্যোজ্জ্বল। শক্তি শুধু আমার নয় পরিচিত সকলেরই যুগপৎ অতি উপভোগ্য ও সন্ত্রাসসঞ্চারী অঙ্গ। মাত্রাতিরিক্ত পানাভ্যাস নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো ওর ভালোবাসার মানুষজন। অ-শক্তিসুলভ ব্যবহারও করেছে না-পছন্দ লোকদের সঙ্গে।

'ভারতী ভবন'-এ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন। শক্তি এবং আনন্দবাজার-এর আরও জনকয়েক লেখক-কবিকে নিয়ে এসেছে ভবন কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে আসানসোল বইমেলার ছেলেরা ধরে এনেছে কবিতা পড়িয়ে নিতে। এ ব্যাপারেও ও ছিল এতটাই উদার। না,--অর্থ নয় শুধু ভালোবাসার টানেই ও যেত যত্রতত্র।

'কৃষ্ণমৃত্তিকা' সাহিত্য সংস্কৃতি গোষ্ঠীর শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে ও এসেছে কোলিয়ারি পরিবেষ্টিত 'উখরা'-র গুলমোহর ক্লাবে গত বছর। সঙ্গে মীনাক্ষী। শারীরিক কারণে উপস্থিত হতে পারিনি। দিনকয়েক বাদে পেয়েছি ওর আর মীনাক্ষীর উদ্বেগভরা চিঠি,—সঙ্গে অবশ্য বাবুই (শক্তির মেয়ে তিতি)-এর এম এস-সি পাশের সুসংবাদ। ওর ভালোবাসার ঝরণায় স্নান সেরেছে পশ্চিমবাংলার নানা কোণে ছড়িয়ে থাকা ওর নানা ধরণের বন্ধুরা। আমাদের এলাকাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। কখনও চিঠিপত্রে কখনও সাক্ষাৎ যোগাযোগে আবার কখনও বা কমন ফ্রেন্ডদের সুবাদে এখানকার শুভাশুভ সংবাদে ও জড়িয়েই ছিল,—ছিলাম আমরাও।

ওর বেশ কিছু ব্যক্তিগত চিঠি. এখনও আমার হেপাজতে। কুশল বিনিময় ছাড়াও অনেক চিঠিতেই জানার আগ্রহ থাকতো এখানকার পরিচিতদের অনেকের সম্পর্কে। নাম ধরে ধরে। চিঠির শেষে 'ভালো থেকো' নয়তো 'ভালোবাসা'। ভালো ছাড়া মন্দ বাসেনি কাউকে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা না হলে ও যেমন 'উৎপীড়িত' বোধ করতো, একাশিতে আমি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর

থেকে উদ্বিগ্নই ছিল ও। আমার মতো এক নগণ্য বন্ধুর জন্যে এ ভাবনা তো ওকেই মানাতো। হেমন্তের অরণ্যের সেই পোস্টম্যানের দেয়া চিঠি, মহত্ত্বের ঐশ্বর্য ছড়ানো সেইসব শব্দমালা,—আমার কাছে দামির চেয়ে দামি।

চিঠিপত্রের কথা যখন উঠছেই তখন বলি গত ৭ মার্চ বাঙ্গালোর থেকে আমাকে লিখেছিল মীনাক্ষী আর শক্তি। শান্তিনিকেতনে দোলের আমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ ওর কাছে কদিন কাটিয়ে আসার। 'অমরেশ চলে এসো—শক্তি।' লাইনটা তো এক অসম্ভব ডাক। এই ডাকের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছি আজও। এ কি 'অবান্তর স্মৃতি'? শক্তি জানতো,—আমি জানি না। এখানকার কত বাড়িতে আর কোয়ার্টার্সে যে ওর পদচ্ছাপ পড়েছে তা মনে করা দুঃসাধ্য। প্রসঙ্গক্রমে বলি—বাসায় বসে 'অবনী বাড়ি আছে' পড়া শেষ হতেই আরও বাড়িয়ে যেত এইভাবে—'নীতিন বাড়ি আছো?' 'অজিত বাড়ি আছো?' ক্রমে চিত্ত-নন্দ-মৃগাঙ্ক-উদয়ন-প্রদীপ পর পর। তারপর হেসে বলতো—'দুদিন আছি,—সব ব্যাটার কড়া নাড়তে হবে।'

ও নেই এ সংবাদে খনি অঞ্চলের কয়লাস্তরে ঘটে গেছে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। এ মুড়ো ও মুড়ো কেঁপেছে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার সঙ্গে সুদ্ধ এ জায়গাও। 'মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক / পড়ে থাকে কিছুদিন'—শক্তির লেখা। শক্তির ক্ষেত্রে এই 'কিছুদিন' কতদিন? একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে, কিছুটা থিতু হয়ে আসানসোল বুকে বেদনার পিরিচ ভরে বসেছে শক্তির প্রতিকৃতি ঘিরে, শক্তির কবিতার মন্ত্রোচ্চারণে নিজেদের একটু কম নষ্ট করতে চেয়ে। সাথী হিসেবে পেয়েছিল শক্তির কবিতার জন্ম-সহচর অমিতাভ দাশগুপ্তকেও গত ২৩ এপ্রিল রবিবার।

ভাগ্যিস শক্তি নেই। থাকলে নিশ্চয়ই আবার বলতো—'তোমার এত কথা লেখার কী দরকার? বলেছি না—সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও। মানসিকভাবে একেবারে ভোঁতা হয়ে যাও। আমি চেষ্টা করে হয়েছি। তাই ভালো আছি শারীরিকভাবে।'

কান্না আর আকাশবিষয়ক কিছু কথাবার্তা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শক্তিদা, আর নেই। এটা মেনে নিতে যতবার এই ক-দিনের মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি, চোখে পড়েছে, কি একটা বিচিত্র কারণে আমি পারছি না। তার মানে এই নয় যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল আমার, রোজ-রোজ দেখা হত। বরং উল্টোটাই—যে, খুব কমই দেখা হত আমাদের, হলেও, তেমন বেশি কথা যে হত তা বোধ হয় নয়। কিন্তু শক্তিদা, শক্তি চট্টোপধ্যায় নেই, ওই গম্ভীর ডাক আর কখনও শুনতে পাব না যে, এই "চৈতালী, এদিকে শোন্—আ-মি ডাকছি—" এটা মেনে নিতে, এত শিগ্গির, যে পারে পারুক আমি পারব না। পারব না "শক্তিদা নেই" এটা মাথায় রেখে গম্ভীর-গম্ভীর সব কথা গেঁথে প্রবন্ধ সাজাতে।

কেন পারব না? আপনজন, আমি বলি. দু-ধরনের হয়। একদল আমাদের দৈনন্দিনতায় আপন, তাঁদের না-হলে চলে না আমাদের একফোঁটাও আর অন্যদল আপন অস্তিত্বের প্রশ্নে, দৈনন্দিনতার অতীত যে বেঁচে-থাকা আমাদের সেখানেই তাঁরা থাকেন। এইরকম আপনজনেরা হুটহাট করে এ-ভাবে চলে গেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে ওঠে, চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। এবং প্রবন্ধ যে ওই লিখতে পারব না বলছিলাম না, ওর কারণটাও বোধ হয় এই। কোথায় কী যেন একটা ধ্বসে-পড়ার শব্দ সেখানে শুনতে পায় মানুষ, ভাষা হারিয়ে যায় যার মুখোমুখি। আমি নিজে একদম শোক সহ্য করতে পারি না এইরকম। গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা, হয়তো যাওয়াই হয়ে উঠত না তেমন, বা গেলেও বলে-ওঠা, কোনোকিছু, তবু, এই যে একটা জায়গা, এগুলো ভেঙে গেলে দেখেছি সবকিছু কেমন যেন অচেনা-অচেনা ঠেকতে থাকে, নতুন আর অন্যরকম লাগে চারদিক, হ্যাঁ, ফাঁকা মনে হয়। আমি তাই শোকসভায় যাই না পারতপক্ষে। যেতে চাই না।

শক্তিদাকে বাইরে থেকে সেভাবে যাকে চেনা বলে তা হয়তো বেশি চিনতাম না আমি। কিন্তু কাকে বলে কবিতা সেটা আমার একটা বিপজ্জনক বয়সে আমি টের পেয়েছিলাম ওই শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়েই।

একই সঙ্গে কবিতার রহস্য এবং তার অনন্ত আঁধার এ যে কী তা শুই শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়েই টের পাওয়া আমার। পাওয়া এবং এমনই এক পাওয়া এ যার কোনো উত্তরাধিকার হয় না, 'অর্থ' হয় না কোনোরকম। আমি শক্তিদার ভক্ত ছিলাম কি, বলতে পারব না। মনে আছে বু, ব. মারা যাবার পর উনি নিজেই লিখেছিলেন সেই অসামান্য শোককথা "তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরসা পেতো কবি. ছায়া পেতো, স্বচ্ছলতা পেতো··" তা, এই যে 'বৃক্ষের ভরসা' এ-কথা লেখবার জন্য কি শক্তিদাকে বু ব.-র ভক্ত হতে হয়েছিল ? আমি তো বলি, না ! 'ভক্ত' ঠিক আছে, শক্তিদার ভক্তের সংখ্যাও কম নয়, আমি ততটা বড় হতে পারিনি এখনও (এবং পারবও কি কোনোদিন ?)—আমি বরং শক্তিদার বিষাদটুকু, এলোমেলো অন্যমনস্কতাটুকু টের পাই, টের পাই সেই অসীম মগ্নতা যার এ-পার, ও-পার কিছুই দেখা যায় না।

কেমন লিখতেন শক্তিদা (অতীতার্থক ক্রিয়াপদটি এই যে ব্যবহার করলাম, দেখুন, আমি দেখতে পাচ্ছি ও'র সেই ছেলেমানুষের মতো হাসি, এর মুখোমুখি, যে হাসি শেষ দেখার শান্তিনিকেতনী-সকালে পর্যন্ত স্পর্শ করে গেছিল আমায়) —আমি বলতে পারব না। বা বলি, আমি বলার কেউ নই। অধিকারী-ই নই এ-সবের। সমস্ত অস্তিত্ব আমার জড়িয়ে রেখেছে যে আলুথালু, কোমল মগ্নতাময় বিষণ্ণ আঁধার, যার মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন আমি আলো চিনে-চিনে পথ হাঁটি তাকে বোঝাব এমন শব্দের ভাণ্ডার-ই বা কই আমার ! আমি কেবল বলতে পারি যে, আমি ও'র সেই গোঁড়া পাঠক, যে একটি শব্দও কখনও বাদ দেয়নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। দেব কী করে—সে দেবার যে ক্ষমতাই ছিল না আমার ; ফলে ও থাক, অন্য কথাতেই আসি ফের।

অনেককে আমি বলতে শুনেছি যে শক্তিদা নাকি কাউকে পাত্তা দিতেন না। আমি সাধ্যমতো এর প্রতিবাদ করে আসছি গত বছর কয়েক। করে আসছি কেননা উনি আমাদের দেখেছি প্রত্যেককেই মনে রাখতেন, দেখা হলে খোঁজ নিতেন নাম করে-করে। অনেক ঝগড়া, বহু মতদ্বৈধের পরেও শক্তিদাকে এই জায়গা থেকে নড়তে দেখিনি আমি। খুব দুঃখ পেতেন, দুঃখ পেলে কেমন যেন নিঃসঙ্গও হয়ে আসতেন, খুব একা হয়ে যেতেন। বিশাল আড্ডার মধ্যিখানেও শক্তিদাকে আমি দেখেছি আনমনা, কী যেন ভাবছেন। ডাকলে সাড়া পাওয়া যেত না ওই সব সময়। আবার ওই শক্তিদাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন পছন্দ মতো গান শুনলে। ভাল-লাগার আড্ডায় আরব্য গল্প-কথার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

খোলস ছেড়ে ফেলতেন উনি। ছেলেমানুষের মতো কথা বলতেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন নিজের লেখার প্রশংসা শুনলে। আবার পরক্ষণেই বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। আপন মনে কী যেন আউড়ে নিয়ে কাউকে স্রেফ পাত্তা না দিয়েই তারপর আড্ডা থেকে উঠে পড়তেন হয়তো। বেরিয়ে যেতেন। এই শক্তিদাকে গত কয়েকটা বছর নানাভাবে দেখেছি আমি। নানাভাবে দেখেছি। আমি মনে করি না একজন মানুষকে সর্বদাই অন্যের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। এ হয় না। হলে মানুষটা মরে গিয়ে কেবল একটা সামাজিক খোলস পড়ে থাকে। শক্তিদার এই খোলসটা আমি কখনও আছে দেখিনি। ভূমিকাহীনতার মধ্যে দিয়ে ভূমিকা নেবার দিকে এসেছিলেন তিনি। এ-জন্যে কষ্টও পেয়েছেন বিস্তর। কষ্ট দিয়েওছেন পরিজনদের। এই এখান থেকেই কবিতা তৈরি হত ওঁর। বেঁচে থাকা আসত।

মানুষের সবথেকে মূল্যবান সম্পদ তার মনের হয়ে-ওঠার সময়টুকু। শক্তিদা মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার জীবনের গোটা ওই সময় বৃত্তটাই অ্যালবামে আটকে-থাকা ফটোর মধ্যে চলে গেল। এ-ও এক ম্যাজিক। ভয়ানক ম্যাজিক। শক্তিদা গত ২৩ মার্চ আমাদের এই শেষ ম্যাজিকটাই দেখিয়ে গেলেন। ওঁকে আমার প্রণাম।

অসময়েই চলে গেল ঐ বাউল-মন কবি

সিদ্ধেশ

বাংলার একমাত্র বাউল মন কবি, জীবনানন্দ দাশের পর সবথেকে বেশি মন কেড়ে নেওয়া কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেল। যতদিন বেঁচেছিল কোনো কোনো ব্যাপারে ওকে বরদাস্ত করতে পারিনি আমি। নতুন কবিদের কাছে ও যতটা প্রিয় ছিল ততটাই নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল তার সমকালীনদের প্রতি। ছন্দের কথা তুলে একবার কবিদের ভিত নড়িয়ে দিলে প্রাচীন নবীন সকল কবিই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অস্বীকার করে হঠাৎ তাঁকে গীতিকার সাব্যস্ত করার ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হয়েছিল। আবার সেই শক্তিই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নভূমি শান্তিনিকেতনে কবিতার ক্লাস নিতে শুরু করেছিল। কিছুদিন ধরে 'ভিজিটিং প্রফেসর' হিসেবে সেখানে নতুন কবিদের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিধাতার পরিহাস, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় শহরের বদ্ধতায় এসে মৃত্যুবরণ করলেন আর শক্তি নিজের আত্মাকে ছেড়ে এল শান্তিনিকেতনের খোলা বাতাসে। ক্লাস নেবার সময় শক্তি বলেছিল—শান্তিনিকেতনে থেকে কবিতা লেখা যায় না। এখান থেকে বেরিয়ে মানুষের মধ্যেই কবিতা চাষের উপযুক্ত জমি খুঁজে নিতে হয়।

গত বছর ও চাকরি থেকে অবসর নেয়। যেন এই অবসর জীবনের জন্য ও উদগ্রীব ছিল, একেবারে বন্ধনহীন স্বাধীন, চেয়ার-টেবিল নিয়ম-নীতির পিছু টান নেই। বন্ধনহীন-মুক্ত-বেপরোয়া-উদাসীন কবি সকলের সঙ্গে অবাধ বিচরণে বিশ্বাসী। তার বিচরণ ছিল কারো ভাবনায়, কারো মস্তিষ্কের উর্বরতায়, কারো বা কবিতার গভীরতায়। হাজার বার লোকে তাকে নিয়ে আলোচনা করেছে, তার গুণপনার বিশ্লেষণ করেছে—কিন্তু তাকে সামনে পেয়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। এই এড়িয়ে যাওয়ার পেছনে কি ভয় কাজ করেছে না ভক্তি! শক্তি কিন্তু কখনো কারো পেছনে লাগেনি, আড়ালে কারো অহেতুক নিন্দা করেনি—ওর যা কিছু ছিল খোলাখুলি, সামনাসামনি। সকলের মাঝে সকলকে জড়িয়েই শক্তি। মদ্যপানে ছিল ওর বদনাম। বেশি খেয়ে বেহুঁশ হলে অসৎ নীতিহীন লোকদের ওপর আক্রোশে ও ফেটে পড়ত। তখন শক্তির আরেক চেহারা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারপিট করতেও দ্বিধা করেনি—তার সেই উগ্রবাদী চেহারা আমি দেখেছি। তাজা টগবগে গলিত ইস্পাত! এই সব নিয়েই ও এত লোকপ্রিয়, এত কাছের মানুষ।

আমার সঙ্গে ও ছিল অনেক ঘনিষ্ঠ। ভুলতে পারি না শক্তিকে, ভোলা যায় না। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে ওর সবসময় আনাগোনা। তখন ওর কবিতা তেজী ঘোড়ার মতো ছুটছে। পঞ্চ দশকের বাংলা কবিতার রূপরেখায় একটি পরিবর্তন আনে শক্তি। 'হাংরি জেনারেশনের' অন্তর্ভুক্ত শক্তি কিন্তু এই কবিতা আন্দোলনকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। সুনীল ও শক্তির মিলিত প্রয়াস 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা কবিতাকে একটি নতুন দিকের ইঙ্গিত দেয়। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় এই সময়েই। ওকে তখন দেখা যেত কখনো শ্মশানের উদাসীনতায়, কখনো বা ফুটপাথ বদলের অস্থিরতায়—একেবারে বোহেমিয়ান জীবন। দিনের বেলায় কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় তো রাত্রিবেলায় খালাসীটোলার রেস্তোরাঁয়—তার পেছনে তরুণ কবিদের জমায়েত। ভাবা যায় না। আমি হিন্দিভাষী হয়েও ওর সঙ্গী ছিলাম। আমি কবিতা লিখতাম, কবিতা অনুবাদও করতাম। ওর কবিতা, গল্পের অনুবাদ হিন্দি পত্রিকাতেও বেরিয়েছে। তাই শক্তি শুধু বাঙালিদেরই নয়, হিন্দিভাষীদেরও আপন জন।

শক্তির সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম—শক্তি কেমন আছো? বলতো—মোটামুটি। তারপর আমরা দুজনে গাল ফুলিয়ে মোটামুটির অভিনয় করতাম। হাসতাম। শক্তির সে হাসি অনাবিল।

একবার ঠিক হল আমরা বাংলার গ্রাম দেখতে যাবো। সে সময় 'ফিরঙ্গী'র পরিচালক শিবেন্দ্র সিন্হা কলকাতারই এক হোটেলে ছিলেন। আমি শক্তির সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিই। উনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে। যাবার দিন সকাল-বেলায় আমি শিবেন্দ্রর হোটেলে এলাম। শিবেন্দ্র বললেন, শক্তি কাল রাত্রে এখানেই ছিল। ওকে জাগালাম—দেখি তার ঠোঁট ফোলা, নাক ও গালে রক্তের দাগ। রাত্রে হয়তো কারো সঙ্গে মারপিট করে এসেছে। কিন্তু শক্তির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই—ঐ অবস্থাতেই একেবারে তৈরি বাংলার গ্রাম দেখার জন্য।

উড়িষ্যার চাঁদীপুরে সমুদ্রের ধারে অজস্র বালি। সেই বালির ওপর শক্তি লাগালো দৌড়—পেছনে পেছনে দৌড়ানো কুকুরের চিৎকার—আমার সাহসই হয়নি কুকুরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মত্ত ওকে আটকাই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ এই আদিম খেলা দেখতে লাগলাম, আর ভাবলাম এটা শক্তির দ্বারাই সম্ভব। আমি তো সভ্য জগতের সভ্য পুতুল, কি করে জানব আদিম জগতের এই দুর্দমনীয় নেশাগ্রস্ত খেলা যেখানে প্রকৃতি, পশু ও পুরুষ এক হয়ে যায়।

---

* সিদ্ধেশ বিশিষ্ট হিন্দিভাষী গদ্যকার, অনুবাদক ও আলোচক।

দাড়িজেঠু

দোলন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পরিচয়ের কোনো গল্প নেই। নেহাতই মামুলিভাবে, অজ্ঞানে, অচেতনে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ আমার। সেই ১৯৬৫ তে— সম্ভবত জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। কবিতা শব্দটা গোচরে আসার অনেক আগেই কবিকে চিনেছিলাম। অবশ্যই কাব্যিক চেতনা দিয়ে নয়, নিবিড় আত্মীয়তা দিয়ে।

আবছা, ভীষণই আবছা মনে পড়ে সেসব দিনের কথা। আমাদের বাগবাজারের বাড়িটা তখন লোকে-লস্করে, আড্ডায়-আন্তরিকতায় গমগম করত। একতলায় ছিল ট্রেড্‌ল্‌ ও ফ্ল্যাট মেসিনের শব্দদূষণ। আর দোতলা, তিনতলা, চিলেকোঠা জুড়ে অগণিত আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে সময়টা ঠিক আজকের মত পেশাদারী ছিল না। বাগবাজারের তদনীন্তন ঢালাও পারিবারিক কাঠামোতে কে বাবার পিসতুতো, কে খুড়তুতো আর কেই বা নিজের ভাই তা ঠাহর করার মত বোধ এবং পরিবেশ কোনোটাই সেই কাঁচা শৈশব-কৈশোরে আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। ফলে প্রায় বিশ-বাইশ জন কাকা-জ্যাঠার সম্বোধন আবিস্কার করতে আমাদের হয়রানির চূড়ান্তে পৌঁছুতে হত। নাম ধ'রে কাকা-মামা-জ্যাঠা ডাকাটাও সে সময় ভয়ংকর শিষ্টতা-বিরোধী ছিল।

এমতাবস্থায় আমরা ভাইবোনেরা সম্বোধনে বৈচিত্র্যের সন্ধানে অভিযান চালালাম। এই অভিযানেরই ফলশ্রুতি হিসেবে তখন একগাল দাড়িওয়ালা হাংরি জেনারেশনের উদ্দাম কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ডাকতে শুরু করলাম 'দাড়িজেঠু' ব'লে।

দাড়িজেঠুর যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স দু বছর। স্বাভাবিক কারণেই আমার কোনো স্মৃতি নেই সেই বিবাহ অনুষ্ঠানের। দাড়িজেঠুর বণ্ডেল রোডের বাড়িটার কথাও খুবই অস্পষ্ট মনে পড়ে। বেশ গোছানো স্মৃতি আছে আমার পার্কসার্কাসের বাড়িটার। মনে আছে মাঝে মধ্যেই বাবার সঙ্গে যেতাম সেখানে।

বাবুই তাতার তখন নিতান্ত বাচ্চা। জেঠিমাকে একটু একটু ভয় লাগতো সে সময়। কিন্তু দাড়িজেঠুকে ভয়?—কদাপি নয়! কুত্রাপি নয়!

শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরে পা দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কানাঘুষো শুনলাম যে, দাড়িজেঠু নাকি বিশাল কবি। কবি বলতে তখন বুঝি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখকে। বাবার কাছে দাড়িজেঠুর অনেক বই-ই ছিল। চোরাগোপ্তা পথে সেইগুলোর দুটো একটা পাতা ওল্টালাম। মোটেই মিলল না পাল্কির গান, হুঁকোমুখো অথবা কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ির সঙ্গে। হতাশ হলাম খুবই। কি যে ছাই লেখে দাড়িজেঠু!

ঠিক এই সময়ই ছোটোদের জন্য আনন্দমেলায় লেখা দেখলাম দাড়িজেঠুর। গ্রন্থে আমার ছাতি উঠল দুগুনো হ'য়ে। স্কুলে পাড়ায় সর্বত্র সগর্বে ঘোষণা করলাম, এই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই আমার দাড়িজেঠু। কেউ কেউ বিশ্বাস করল। নানা প্রশ্নে আমায় পরীক্ষা চালাল। আবার কেউ কেউ বিনা নিরীক্ষাতেই বলে দিল, গুল মারছি।

শুনে দুঃখ পেলাম ব্যাপক। রাগও হল হিংসুটেদের ওপর। একদিন দাড়িজেঠুর কোল ঘেঁসে জানালাম দুঃখ। তৎক্ষণাৎ সমাধান—হাতের কাছের বইটাতে লিখে দিলেন, "চুমকীকে দাড়িজেঠু।" ব্যাস এক আঁচড়েই বাজীমাৎ।

কৈশোর গড়ালো এরই মধ্যে। বয়ঃসন্ধির শেষভাগে পৌঁছুলাম দাড়িজেঠুর কবিতায়। বুঝতাম সামান্যই। অথচ কি এক না বোঝা বিভোলতায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। পাশাপাশি মেলাতাম মানুষটাকে। আর এইখানেই খেতাম হোঁচট্। এত বড় কবি! অথচ কি ভীষণ প্রচারবিমুখ সারল্য! কি অপরিসীম স্নেহময়তা! কি সুবিশাল হৃদয়বত্তা! কবিতা নিয়ে কোনো বাগাড়ম্বর শুনিনি কখনও দাড়িজেঠুর মুখে। পাণ্ডিত্যের আস্ফালন তো দূরের কথা, ওঁর ষোলোআনা কবিতাময় জীবনের এক আনারও প্রতিফলন ঘটতে দেখিনি বাড়িতে কোনোদিন। সত্যি বলতে কি, আমার ভাই তো প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, "দাড়িজেঠু তুমি লেখো কখন?" অর্থাৎ লেখালেখিটাও করতেন একান্ত সঙ্গোপনে, অনাড়ম্বরতায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, এক চূড়ান্ত পেশাদারি চাটুল্যের মধ্যে অবস্থান করেও কীভাবে পারিপার্শ্বিক থেকে শুধুমাত্র দুধটুকুই গ্রহণ করেছিলেন মানুষটা।

জীবনেই নানা বিশেষণে ভূষিত হয়েছিলেন দাড়িজেঠু। বোহেমিয়ান শব্দটি হয়তো সঠিকভাবেই তাঁর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হত। কিন্তু তথাপি একথাও সোচ্চারে

স্বীকার্য সে, স্বেচ্ছাচারী বোহেমিয়ান কবি অন্তরঙ্গে ছিলেন দারুণ সংসারপ্রেমী, বন্ধুবৎসল এবং নিখাদ বাৎসল্যে ভরপুর। আশি বছরের মামার মৃত্যুতে ওঁর উদ্বেলতা দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না যে, এই মানুষটিরই কলম-নিঃসৃত সেই নিষ্ঠুরতা—"কোনোদিন পাবে না আমাকে, কোনোদিনই পাবে না আমাকে।"

ওঁর মামা হলেন আমার দাদু। ১৯৮৬-তে তাঁর মৃত্যুতে শ্মশানঘাটে দাড়িজেঠুর আর্তি, সন্তানের নিয়মে অশৌচপালন এবং স্মৃতিতর্পণের সুষ্ঠু উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুধুই নীড়-প্রেমী সদ্য পিতৃহারা এক ছাপোষা সন্তানকে দেখতে পেয়েছিলাম আমরা। প্রকৃতপক্ষে, দুর্ধর্ষ কাব্যিক এই মানুষটা বাড়িতে ছিলেন একেবারেই পারিবারিক—কারো বাবা, কারো স্বামী, কারো দাদা, কারো বা জ্যাঠা-কাকা-মামা। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে, বছর দশেক আগে যখন সব বাঙালির মত আমিও একটু-আধটু কাব্যচর্চায় মন দিই, তখন কবিতা সংক্রান্ত প্রয়োজনে আমি সবসময় অমিতাভ জেঠুর (কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত) কাছে গেছি। দাড়িজেঠুর কাছে যাইনি। অমিতাভ জেঠু প্রায়ই বলতেন, "তোর অতবড় কবি জ্যাঠা থাকতে ওঁর কাছে যাস না কেন?" চুপ ক'রে থাকতাম। সেদিন সঠিক উত্তরটা উপলব্ধিতে ছিল না হয়তো। যদিও আজ নির্দ্বিধায় বুঝি, দাড়িজেঠু আমার শুধুই জ্যাঠা ছিলেন, কবি-জ্যাঠা ছিলেন না কখনো।

আর একটা মজার কথা। চূড়ান্ত বেনিয়মী, বহির্মুখী এই মানুষটা প্রিয়জনদের বিষয়ে কিন্তু দারুণ উদ্বেগপ্রবণ ছিলেন। বাবুই, তাতার এমনকি জেঠিমা পর্যন্ত অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি করলে দাড়িজেঠু ভীষণ উদ্বেগে ভুগতেন এবং ছটফট, খোঁজখবর ক'রে একেবারে সোরগোল ফেলে দিতেন। সন্তান বা সন্তানতুল্যদের প্রশ্নে দারুণ উচ্ছ্বাসপ্রবণও ছিলেন। বাবুই বা তাতারের কোনো সাফল্যে পঞ্চমুখে দামামা বাজিয়ে বেড়াতেন। এই তো সেদিনের কথা—তাতারের উচ্চমাধ্যমিকের সাফল্যে দাড়িজেঠু যেন আনন্দকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না।

কবির এই মমত্ববোধ কিন্তু পরিণত যৌবন বা প্রৌঢ়ত্বের স্বাভাবিক দানমাত্র নয়। বাবার মুখে শুনেছি, সেই গভীর শৈশবে যখন বাবা ও দাড়িজেঠু একসঙ্গে বহড়ুতে থাকতেন, তখন সাড়ে তিন বছরের ছোটো ভাই আমার বাবাকে একেবারে পাঁজরে আগলে রাখতেন আট বছরের দাদাভাই (বাবারা সবাই দাড়িজেঠুকে এই সম্বোধনেই ডাকতেন)। শুনেছি বহড়ুতে সেই কৈশোরে বাবাকে নাকি খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু ক'রে কেউটের মুখ থেকে নিজেকে তাচ্ছিল্য

ক'রে বাঁচানো পর্যন্ত সবই করেছেন দাড়িজেঠু। পরবর্তীকালে, বাবা তো প্রায়ই দাড়িজেঠুকে বলতেন, "গ্রামে ছোটোবেলা কাটিয়েও তোর জন্যই আমার সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা কিছুই শেখা হয়নি। এমন আগলে রাখতিস আমায়।"

আরও শুনেছি, কৈশোরের অন্তিমে, ১৯৪৮-এ বাগবাজারের বাড়ি থেকে দাড়িজেঠুর নেতৃত্বে হাতে লেখা পত্রিকা বার হত। সেই পত্রিকার নাম প্রথমে ছিল 'প্রগতি'। পরে বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি'-র খবর পেয়ে দাড়িজেঠুই পত্রিকার নাম পাল্টে রাখেন, 'নবোদয়'। এই 'নবোদয়'-এ দাড়িজেঠু নিজে শুধু লিখতেন না, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবদের প্রত্যেকের যাতে লেখার প্রতি উদ্দীপনা থাকে, সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই দাড়িজেঠুকে যথাযথ সন্তুষ্ট করতে পারত না। ফলে শেষ মুহূর্তে দাড়িজেঠুই বিভিন্ন নামে পাতা ভরাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এসময়ই তিনি প্রথম স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামটি ব্যবহার করেন।

শেষ কয়েকবছর দাড়িজেঠুর সঙ্গে পাশাপাশি কাটালাম। পূর্বাঙ্গনায়। এ কবছরে মানুষটাকে আরও পরিণত চেতনা নিয়ে দেখেছি। আর যতই দেখেছি, ততই ওঁর সারল্যে আপ্লুত হয়েছি। ইদানীংকালে ওঁর রোজনামচার শুরুটাই ছিল সদ্যকিশোরের মত। শারীরিক কারণেই বাড়িতে চা খাওয়ার বাঁধাবাঁধি ছিল দাড়িজেঠুর। তাই সকালে বাড়ির চাপর্ব চুকিয়েই দাড়িজেঠু পূর্বাঙ্গনার এবাড়ি ওবাড়ি হানা দিতেন চায়ের হুকুম দিয়ে। আমাদের বাড়িতেও প্রায় সকালেই আসতেন। এসেই জিজ্ঞাসা করতেন, "স্বপ্নার (মানে আমার মা'র) মেজাজ কেমন?" বলেই মুচকি হাসতেন। ছেলেমানুষের দুষ্টুমির হাসি। মায়ের মেজাজ অনুকূল থাকলে মাকে নিজেই বলতেন চায়ের কথা। মায়ের সঙ্গে দাড়িজেঠুর সম্পর্ক, বাল্যে আমার দাদামশায়ের ছাত্র এবং মামার বন্ধু ছিলেন দাড়িজেঠু। ফলত দাড়িজেঠুর ওপর মায়ের দাবিটা ছিল ভ্রাতৃত্বের, নিছক সৌজন্যের নয়। মা জানতেন বেশি চা, সিগারেট দাড়িজেঠুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। তাই প্রথমবার মা বেশ রাগতভাবেই চায়ের আব্দার নাকচ করতেন। কিন্তু সে নাকচ টিঁকত না। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবাদ পুরুষকে সামান্য এককাপ চায়ের জন্য এত অনুনয় বিনয় করতে শুনে হেসে ফেলতেন মা। আর সেই সময়ই সব রাগ জল ক'রে দিয়ে মানুষটা বলে উঠতেন, "এত ভয় পাও কেন খামোখা? আমি এখনও অনেকদিন বাঁচব। অ-নে-ক দিন।"

শুধু আমাদের বাড়ি নয়। পূর্বাঙ্গনার সব বাড়িতেই অবাধ যাতায়াত, অগাধ আব্দার ছিল ওঁর। পূর্বাঙ্গনায় যে কোনো ছুতো-নাতায় গানবাজনার আসর বসত। আর সে আসরের সর্বদা মধ্যমণি থাকত দুই ন্যাংটো বয়সের বন্ধু—দাড়িজেঠু ও আমার মামা (শান্তি চক্রবর্তী)। দুজনেই দারুণ চড়ায় নিজস্ব স্কেলে একই গান ধরতেন একসঙ্গে। দু কলি বাদেই বাঁধত ধুন্ধুমার। দুজনেই দুজনকে ভুল গাওয়ার জন্য দোষারোপ করতেন। গত জানুয়ারিতেই এমন একটা ঘরোয়া আসরে দুজনের তর্কাতর্কির জের টেনে দাড়িজেঠু মামার দিকে একেবারে পিছন ফিরে বসলেন গোঁসা ক'রে। অবশেষে অন্যরা যখন যথেষ্ট সাধ্য-সাধনায় তুষ্ট করল, তখন ছেলেমানুষের মত গর্বিত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে আবারও গান ধরলেন—

—"মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।"

বস্তুত পূর্বাঙ্গনার সবাই যে সময়টা একেবারেই ভুলতে বসেছিল যে, এক বিখ্যাত কবি তাঁদের প্রতিবেশী, ঠিক সেই সময়ই এই অতর্কিত মৃত্যু তাঁদের মনে করিয়ে দিয়ে গেল যে, শুধু দিলদরিয়া এক মানুষ তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল না, এক অসমসাহসী বাঙালি কবিও তোমাদের দিনগুজরানের সহমর্মী ছিল।

আর একটা কথা না জানালে এ স্মরণ-কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দাড়িজেঠু শুধু শিশুসুলভ ছিলেন না, দারুণ শিশুপ্রেমীও ছিলেন। 'পূর্বাঙ্গনা'-র সমস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে দাড়িজেঠুর ছিল নিটোল বন্ধুত্ব। আমার আড়াই বছরের কন্যা তিয়াস তো ছিল দাড়িজেঠুর অন্যতম প্রিয় বান্ধবী। এই তো সেদিনের কথা। তিয়াসের জন্মদিন। দাড়িজেঠু এলেন একটা অসাধারণ ছড়া পকেটে ক'রে। আদো আদো বুলিতে তিয়াসকে দিয়ে আবৃত্তিও করালেন সেই ছড়া—

বর্ষাদিনের তিয়াসকে

তিয়াস তিয়াস — বাতাস হাঁকে
আর তিয়াসের বর্ষাদিন।
বর্ষাদিনের মন্দ্র মনে
সব তিয়াসের মনের মনে।
আমার মাটি তিয়াস-পুর
হোক না সে তাই বহুৎ দূর!
তিয়াস তিয়াস — বাতাস হাঁকে
আর তিয়াসের বর্ষাদিন॥ দাড়িদাদু, দিদিমণি, তিতি আর উজান
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আর একবার তিয়াসপদ্রে আসার কথা ছিল দাড়িজেঠদ্রর। মৃত্যুর আচম্বিত ফরমানে সে কথা আর রাখা হল না। তিয়াসপদ্রর বাসেই রইল অনন্ত অপেক্ষায়।

বাংলা কবিতার শেষ নবাব

নন্দদুলাল আচার্য

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবিতকালেই নিজেকে মিথ'-এ পরিণত করেছিলেন। সেই 'মিথ'-নায়কের সঙ্গে এই শ্যামলা তরুণের প্রথম পরিচয় কবি তারাপদ রায়ের বাড়িতে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বজ্ঞান প্রকাশনীর প্রকাশক আমাদের সবার প্রিয় দেবুদা (দেবকুমার বসু)। ভয় ছিল, পাছে এই স্বৈরাচারী, দুর্দান্ত স্বভাব কবির সঙ্গে পরিচয়ে কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ি। আশঙ্কা ছিল, কেমন হবে কবির আচরণ? কিন্তু কবিকে দেখেই আমার সব ভয় কেটে গেল। শান্ত-পরিশীলিত; ব্যবহার যথার্থ কবির মতই স্নিগ্ধ, আন্তরিক। বেশি কথা হয়নি। শুধু পরিচয় বিনিময়েই শেষ হয় এই সাক্ষাৎকার।

শক্তিদা'র প্রিয়তম সখা অমিতাভ দাশগুপ্ত ডিসেরগড় স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। সে সময় এ অধম তাঁর ছাত্র ছিল। ঐসব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আবার চাগিয়ে উঠল অমিতাভদার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচয়ে। পরিচয় করিয়ে দেন গণশিল্পী অজিত পান্ডে। তখন পাহাড় ছেঁড়া নদীর মত সব স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই অমিতাভদা'র মুখেই শক্তিদা'র অসংখ্য রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছি। জলপাইগুড়িতে থাকার সময় শক্তিদা প্রতিবছর মরশুমী পাখির মত ওখানে যেতেন। এক চিলতে কাঠের বাড়ি। সেখানেই থেকে যেতেন অনেকদিন। ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরতেন তরুণ শোণিতের প্রবল উচ্ছ্বাসে। জঙ্গলে জঙ্গলে সাবলীল ঘুরে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন অনেকখানি প্রকৃতিময়।

সালটা মনে নেই। ১৯৮১-৮২ হবে। 'রাঢ়পত্র' কাগজের উদ্যোগে আসানসোলের এক সাহিত্যবাসরে সেবার এসেছিলেন শক্তি, অমিতাভ, অরুণ চক্রবর্তী, আনন্দ ঘোষহাজরা, দেবকুমার বসু থেকে শুরু করে আরও অনেকে। ছিলেন উদয়ন ঘোষ, প্রদীপ দাশশর্মা, জয়া মিত্র, সমরেশ দাশগুপ্ত, সঞ্জীব চট্টরাজ সহ শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু নবীন-প্রবীণ কবি ও কবিতানুরাগী বন্ধুদল। সেই সভায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আসার কথা। আসেননি বলে শ্রোতারা দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন উদ্যোক্তাদের ওপর।

সভাশেষে অনেকেই ডিসেরগড় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ডিসেরগড়ে আমাদের তিনটি বাড়িকে ঘিরে সেসময় সাহিত্যের আড্ডা জমে উঠত। গণশিল্পী অজিত পান্ডে, চিত্রী অমরেশ বিশ্বাস আর আমার বাড়ি। আমাদের এই বাড়ির ঘরোয়া বৈঠকে আসেননি কে?

শক্তিদা সেবার সপুত্র তিনদিন থেকে গেলেন ডিসেরগড়ে। সঙ্গী কবিরা, অমিতাভদা ও অরুণ ছাড়া অন্যরা ফিরে গেলেন পরদিন বিকেলেই। তখন থেকে শক্তিদার সঙ্গে জমে উঠল আমাদের ঘনিষ্ঠতা। অমরেশদার বাসায় আমাদের একাধিক বিনিদ্ররাত কেটেছে গল্পে-কবিতায়-গানে আর ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। দুজন আপাদমস্তক কবি শক্তি অমিতাভকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। দুজনেই এতো ভালো, আবেগে ভেসে যাওয়া বালকের মত স্বভাব, অথচ কাব্য-নির্মাণে মেধার দীপ্তি। দুজনের গলা ঈশ্বরের মত। পাগলের পারা ভালোবাসেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। কখনও গাইতেন টপ্পা, 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া।'

শক্তিদা ভূতকে নাকি বড় ভয় পেতেন। রাত্রে একা শুতে পারবেন না বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে কাছে শোয়ালেন। সে বার অনেক রাত অব্দি আমরা দুজন গল্প করেছিলাম। 'কবি হবার আগে ভালো মানুষ হতে হবে'—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। নারী ও প্রেম প্রসঙ্গেও ধারণার কথা তিনি আমকে জানিয়ে ছিলেন গল্পে গল্পে। শক্তি ভণ্ড ছিলেন না। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে ছিল না কোন ফারাক। কারু নাম হেলায়-ফেলায় ডাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন না কারও মুখ অপমানে কালো হয়ে যাক। অন্যমনস্ক উদার এই মানুষটি সব সময় মগ্ন থাকতেন কবিতায়। কবিতা ছিল তাঁর প্রাণ বায়ু।

ডিসেরগড়ে তিনি কতবার এসেছেন সঠিক বলতে পারব না। তবে বহুবার এসেছেন। কখনো একা, কখনো পুত্র তাতারকে সঙ্গে নিয়ে। কখনো কন্যা তিতি ও স্ত্রী মীনাক্ষীকে নিয়ে। আর অধিকাংশ সময়ে তাঁর এই সফর-সঙ্গী ছিছেন তাঁর পরম সুহৃদ অমিতাভ দাশগুপ্ত। এই দুই কবির দুজনের প্রতি ভালোবাসা ছিল অন্তহীন। দুজনের আসক্তি চণ্ডালের মত, আবার দুজনেই ছিলেন সন্ন্যাসীর মত উদাসীন। মদ ছিল এদের প্রিয় পানীয়। মদ্য পান করলে কোন অলৌকিক অনুভব ওঁদের ভর করত। কবিতার পর কবিতা। কবিতা শেষ হলে গান। আর গানেও শেষ হলে শুরু হত কথা, কবিতার-ই ডানা ছুঁয়ে।

১৯৮২ সালে শক্তিদা যখন আকাডেমি পুরস্কার পান, তখন ডিসেরগড় তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিল। সেই সংবর্ধনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন তাঁর সহোদর প্রতিম অমিতাভ দাশগুপ্ত। গান গেয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে অজিতদা (পান্ডে)। সেদিন শক্তিদা প্রসঙ্গে অমিতাভদার বক্তব্যকে যদি টেপ করে ধরে রাখা যেত, সে এক সম্পদ হত। অনেককেই দেখেছি শক্তিদা প্রসঙ্গে বলতে এলে শক্তিদা-র মদ খাওয়ার গল্প বলেন,বলেন তাঁর স্বেচ্ছাচার ও উচ্চন্ড জীবনপ্রণালীর কথা। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলতে খুব কম লোককে দেখেছি। সেদিন অমিতাভ বলেছিলেন, কীভাবে প্রকৃতি, শক্তিকে গিলে খেয়েছিল ; কীভাবে কবিতার খাঁজে খাঁজে হীরকদ্যুতির মত কলমে ওঠে তাঁর সমাজমনস্কতা, কীভাবে আটপৌরে কথাকে তিনি কবিতার খাপে বসিয়ে বাংলা কবিতায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। কীভাবে নির্মাণ করেছেন লিরিক আর সনেটগুচ্ছ ; কীভাবে লিরিককে মুচড়ে দিয়েছেন অ্যান্টিলিরিকে। নিপুণ যাদুকরের মত হাতের তালুতে শব্দকে নিয়ে তাঁর লেখা ; ছন্দগড়া, শব্দকে আদর করে ডাকা, ছিঁড়ে ফেলা ছন্দ তন্তুজাল। বার বার নতুন আঙ্গিকে-ফিরে যাওয়া। আর কবিতার নিহিতে লুকিয়ে থাকা কবির আর্তি, হাহাকার, অভিমান ও কাঙালপনার কথা।

প্রকৃতি-তন্ময় শক্তিদা ডিসেরগড় নদীঘাটে বেড়াতে এলে উন্মাদ হয়ে যেতেন। তিন দিক থেকে আসা তিনটি নদীর জল মিশেছে এখানে। ত্রিধারা সঙ্গমে সবুজ টিপের মত ছোট্ট দ্বীপ গাঙটিকুলি। ঐ দ্বীপ, নদীর ওপারে নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা মৌলি পাহাড় পাঞ্চেত, এ পারে দীর্ঘ প্রসারিত শালবন। আদিম প্রকৃতির এই মায়াবী টানে শক্তি অমিতাভ বার বার ছুটে আসতেন এখানে।

রাত্রিকে রাত্রি মনে হত না। আমাদের কজন তরুণ স্কুল শিক্ষিকা মুগ্ধ শ্রোতার মত বসে থাকত কবিদের ঘিরে। কেউ গাইত গান, কেউ বা কবিতা। আর থাকতেন ধীরেন্দ্রনাথ কর। আমরা যাঁকে করদা বলতাম। তিনি ছিলেন আমাদের ঐ সময়ের সিন্ধুবাদ। বহুপঠিত এই মানুষটি দেশ বিদেশের নানা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ঝাঁপিটি যখন খুলে ধরতেন, তখন আমরা তো বটেই, এমনকি শক্তি অমিতাভদা-ও দারুণ আকর্ষণে ঝুঁকে পড়তেন করদা'র দিকে। সেই আড্ডায় থাকতেন চিত্তদা (চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত), অমরেশদা, অমিতদা, রত্না বৌদি, মীনাক্ষী বৌদি, কখনো আমাদের ছেলেমেয়েরা ঝুমলা, বাবলি, তিতি, বাবাই, তাতাই, দীপ্ত, বীরু, রাজা, বলাই, সারদা। কখনো থাকতেন নীতিনদা ও শিপ্রা বৌদি।

ওরা দু জনেই ডাক্তার। কিন্তু কবিতায় সমর্পিত। আর আমাদের পরিচর্যায় সর্বক্ষণ স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় উপস্থিত থাকতেন গায়ত্রীদি ও কল্পনাদি। কবিতার অজুহাতে তাঁদের উপর কম অত্যাচার করিনি। তাঁরা হাসি মুখে সব মেনে নিতেন। কবিতা গান তো হতই। আবেগ চড়ে গেলে অরুণ শুরু করত নাচ। জলপ্রপাতের মত চুল ও দাড়ি নেড়ে তার সে তাণ্ডব ছিল দেখার।

জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে কতবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি পথে। 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে···।' বসন্তের মাতাল সমীরণে এই গান গাইতে গাইতে আমরা যখন হাঁটতাম—পথচারীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত একদল পাগল গাইয়ের দিকে। ভ্রুক্ষেপবিহীন ছিল আমাদের এ মুড়ো ও মুড়ো হাঁটা। সে বড় সুখের সময় ছিল, সে বড় আনন্দের সময়···

বাংলা কবিতার শেষ নবাব শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। সারা কলকাতা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে অন্তিম বিদায় জানালো। তাঁর মর্ত্য শরীর ভেসে গেল আগুনের নদীতে। আমরা এখনো ভাবতে পারছি না শক্তিদা চলে গেছেন। মনে হচ্ছে, তিনি কলকাতা অথবা শান্তিনিকেতনে আছেন। নতুবা কাউকে না জানিয়ে চলে গেছেন ডুয়ার্স কি চাইবাসা। অনলসভাবে হেঁটে চলেছেন মানভূম নয় সিংভূমের জঙ্গলে জঙ্গলে। তাঁর ধাবমান পায়ের পাতায় ঝরে পড়ছে কাঁচা কুসুমের থোক। তিনি দেখছেন মাদল সহযোগে আদিবাসীদের নাচ। সঙ্গে তরুণ কবি। আদিম ছন্দে বয়ে চলেছে সাঁওতালী নদী উতলা। ওর বহতা জলে পা ধুয়ে অনেক রাত্রে ডাকবাংলোয় ফিরে বলছেন,—'মদো দাও।' রবিঠাকুরের গানে গানে ভরে তুলছেন ঝাড়খণ্ডের নীলকান্ত আকাশ। লোহাজাঙ্গী গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ তাঁকে উঁকি মেরে দেখছে। শালফুলের গন্ধ মেখে হাওয়া খেলা করছে তাঁর সুঠাম শরীরে। মনে হচ্ছে যে কোন দিন তিনি ফিরতে পারেন ডিসেরগড়। সহসা মধ্যরাতের বাতাস কাঁপিয়ে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠবে শক্তিদা'র অধীর হাতের ছোঁয়ায়—'নন্দ বাড়ি আছো?'

আয়ত টানাগোড়েন

সুমন গুণ

এই বিদেশে সবই মানায়—
পা-চাপা প্যান্ট, জংলা জামা
ধোপধুরস্ত গলার রুমাল, সঙ্গে থাকলে অশ্বত্থামা
এই বিদেশে সবই মানায়।
ব্রায়ার পাইপ, তীক্ষ্ণ জুতো
নাকের গোড়ায় কামড়ে বসা কালো কাচে রোদের ছুতো
এই বিদেশে সবই মানায়।

কিন্তু তোমার তালছাড়টা—
মেঘে মেদুর সেই যে নচেৎ বাস্তুভিটা
সেখান থেকে বাকি জীবন করবে শুরু বলেই এলে—
যেইখানে আজ অভয় পেলে

এই বিদেশে সবই মানায়

(এই বিদেশে ঃ সোনার মাছি খুন করেছি)

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মেয়েরা ততটা যৌন নয়, এমন দুরূহ আক্ষেপ জানিয়েছেন এক পাকা লেখক, একটি সামান্য দৈনিকে। আমাদের বিরল দুর্ভাগ্য, যে-কেউ তাঁর ইচ্ছে ও অপছন্দ, যে-কোনো বিষয়েই হোক, ঈষৎ মুহূর্ত ও বাচালতা খরচ করলেই যেমন-তেমনভাবে ব'লে দিতে পারেন, কোনো দরকারই হয় না সেই বিষয়সমূহকে তাঁর লালন মেপে নেবার। চোয়াল ঋজু করে সবাক হয়ে ওঠার লোকজনও ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা আছেন, তারাও বুঝতে পারছেন, সংখ্যা ও প্রতাপে সর্বোচ্চ হারে বাড়ছেন এখন ঐসব কুশলী লোকেরাই, তাই নীরবতা নীরবতা নীরবতাই হয়ে উঠছে তাঁদের বিশ্বস্ত আশ্রয়।

তা না হলে, আমাদের সময়ের এক সারবান কবি চলে যাবার পরে চারপাশে যে নিঃস্ব ও কোলাহলময় অন্ধকার নেমে এল সেই কবিকে ঘিরেই, তা অত প্রশ্রয়ে

ঘটতে পারত না। একজন কবির নাম যে শুধু বোতল ও ভাটিখানার টলমল সমার্থক হয়ে উঠতে পারে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বিদায় না জানালে আমরা তা জানতেই পারতাম না। অন্যরকম কিছু কি ছিল না? ছিল তো! দু'একজনের মন উপুর করা আলোচনায়, মণ্ডিত ও অগোচর একটি দুটি আয়োজনে প্রয়াত স্বেচ্ছাচারীকে ছুঁতে পেরেছিলাম আমরা, অবশ্যই। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রুচিবান তথ্যমন্ত্রীর অনুচ্চারিত উদ্যোগে, নানা মহলের সুধীমণ্ডলীর সর্বস্ব আন্তরিকতায় যে শ্রদ্ধাসন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হল নন্দনে, সময় উজার করে আসা মানুষজনই তার মর্ম ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

হয়তো, এখন অল্প অল্প করে আলো পড়বে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আসল সামর্থ্যে, 'The applause! delight! the wonder of our stage'—এর তন্তুরহস্য কেঁপে কেঁপে উঠবে নানা তাৎপর্যে।

সেই পর্যায় শুরু হয়েও গেছে, নিশ্চিত। আমি কবির একটি কবিতার চারপাশ থেকে সেই রহস্যের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলির একটি দুটি শুধু ছুঁয়ে দেখতে চেষ্টা করছি।

একেবারে শুরু থেকেই, কবিতাটি একটি চেনা গড়ন পুরোপুরিই প্রায় মেনে নিয়েছে। এই যে হঠাৎ, প্রায় কথার মাঝখান থেকে শুরু করার ধক, যেন, যা আগের তা পাঠক পড়ে ফেলে তবেই শুরু করল কবিতাটি, তা আমাদের এক স্মরণীয় কবির নানা কবিতায় অনেকবারই দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ার মতো একটি কবিতা : 'বিনিময়'। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই :

তার বদলে পেলে—

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল-বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোয়ানো ছায়া-ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরলো হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে।

ছন্দে, ভঙ্গিতে এমনকি কথারও ঈষৎ সহর্মিতায় দুটি কবিতায় বলার মতো মিল আছে। শক্তির কবিতাটিতে পরবাসের অস্বস্তি আর মেঘে মেদুর বাস্তুভিটার রোমাঞ্চ মিলে এক স্বস্তি ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

স্মৃতি, ব্যথা ও রহস্যের ছবিতে টলটল। 'এই বিদেশে' 'সোনার মাছি খুন করেছি' বই থেকে নেওয়া, এই বইয়েরই আরেকটি কবিতা 'যেতে যেতে'। গড়ন আলাদা, কিন্তু ওখানেও 'পিছন ফিরে' তাকানো, 'যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন'—এমন প্রশ্নার্ত ব্যথা, এবং 'যাত্রী তুমি—পথে বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে'—এই অবধারিত নির্ণয়। গড়ন আলাদা বটেই, 'এই বিদেশে' থেকে, কিন্তু কথায় আর বিষয়ের চাপা টংকারে কি সখ্য নেই, 'বিনিময়' ছন্দের, এমনকি, অমিয় চক্রবর্তীর আরও অন্য কবিতার সঙ্গেই। যাতায়াত, দেশান্তর, স্মৃতির স্পষ্ট ও নিঃশব্দ বাসনা, ধরা ছোঁওয়া যায় এমন টুকরো টুকরো বলা, সব মিলিয়ে এক আয়ত দার্শনিকতা বারবারই দুই কবিকে কাছাকাছি এনেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ গেরাম-গেরস্থালি
পানাপুকুর, শাওলা-দাম, হরিণমারির চর—
(যেতে যেতে)

এই তো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
(যেতে যেতে)

বরং ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা করে, ছিন্নভিন্ন খুঁট কাঁখে গুঁজে
খলবল হাঁটায় দুরন্ত
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।
(সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি)

অমিয় চক্রবর্তীর—

ঝগ্‌ঝগ্‌ ট্রেন শব্দ, স্টেশনের মধ্যে রোদ,
কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখা ডোবা বোধ,
পৌঁছলো তবুও ফিরে চাওয়া,
ক্লাসে পড়ানোর ঘণ্টা ঐ বাজে, ব্যস্ত হাওয়া।
(১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ)

তোমরা ধার্মিক, কৃষ্ণের জীব, বিদ্রোহ করো না,
অদৃষ্ট মানো,

পর জন্মের পথ পাও গলিতেই ; আহা গদ্ গদ্ মাদুলি,
তাগা, মূর্তি, বুকে টানো ;
(চেতন স্যাঁকরা)

থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, দু-পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
(বড়োবাবুর কাছে নিবেদন)

গোদা ভঙ্গিতে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে 'অমুক কবির উপর তমুক কবির প্রভাব' জাতীয় কোনো সমস্যা নিরসনের জন্য এই লেখা নয়। শুধু এই দুই কবি নয়, স্বরায়নের এই মধ্য কেন তা অন্য কোনও কবিকে, কীভাবে ছুঁয়েছে, এবং সব মিলিয়ে এই প্রবণতার গোটা চেহারাটা কী, তা নিয়ে বড়ো করে ভাবার চেষ্টাকে উসকে দেবার জন্যই এই রচনা। 'এই বিদেশে' কবিতাটি পড়তে পড়তে এমন ভাবনা প্রশ্রয় পেতেই পারে। আলাদাভাবে, কবিতাটিতে খুব আত্মীয়তা মাখানো। দেশান্তরের প্রসঙ্গ, আসলে, ঘরের দিকে ফিরে তাকানোর শব্দ আরও জোরালো করার জন্যই। তালছড়ি, মেঘে মেদুর বাস্তুভিটা—সবই নিজেই ঘরের পিঁড়িতে মনকে বসিয়ে রাখছে। মোক্ষম কথাটা বলা হয়েছে তারপরেই : যেখান থেকে বাকি জীবন শুরু করার জন্যই তো বিভুঁয়ে আসা। সেখানে নিজেকে চিনে নিতে পারল, সত্যিই তো, 'এই বিদেশে সবই মানায়।'

কবি — মৃত্যুচেতনা — মৃত্যু

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

আজ আর কোনো পোস্টম্যান নেই হেমন্তের অরণ্যে। হেমন্তের অরণ্যও আর নেই। ব্যস। ঐ দুটি বাক্যই তো হতে পারত এই রচনার সবটুকু বা সবখানি যখন এই সান্ধ্য বাতাসে তিরতির করছে বসন্ত, যে বসন্ত বরফশয্যায়, চন্দনসাজের অগুরুঘ্রাণের, অগ্নির !

বসন্ত উদাসীন হারে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষাদ। অভ্যস্ত হতে পারছি না আমরা। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছি। আমাদের প্রতিটি চিন্তাবৃত্তের, প্রতিটি যাপনবৃত্তের দখল নিয়েছে একটি মৃত্যু। ভেঙে গিয়েছে আমাদের সব ছক সমস্ত গঠন আর সমূহ কাঠামো।

মহীরুহ পতনের কালে বাস্তবতার বিন্যাস এরকমই।

যে মৃত্যু প্রবল আর বিরাট, তাকে অনেকখানি ছেড়ে দিতে হয়, এ নিয়ম জীবনেরই। আর এও তো জীবনেরই নিয়ম, অনেকখানিই আমরা ছেড়ে দিই মৃত্যুচেতনাকে। জীবনকে শুদ্ধ করে মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুচেতনাই জীবনকে যাপনীয় করে।

এবং ঠিক এইখান থেকে যে দ্বান্দ্বিক প্রগতির কথা উঠে আসবে, তাকে আমরা এড়াতে পারব না। জীবন সম্পর্কে যাপনের মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষাগুলি নিয়ত জারিত হয় পরবর্তী অমোঘ অপার শূন্যতা সম্পর্কিত কল্পনার অসহায়তায়। আর এত অবয়বহীনভাবে প্রগাঢ় সেই শূন্যতা যে বৈরাগ্যও কোনো আয়ুধ হতে পারে না। তাই আসে সৃজনপ্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া নিজেই আবার একই সঙ্গে সর্জক ও সৃজিতের ভিতরে নিয়ে আসে মৃত্যুচেতনা। সৃজনকর্মীর পক্ষে মৃত্যুচেতনা, অতএব, এক নির্বিকল্প বাস্তবতা।

কালগত প্রবীণতা ছাড়াও আক্ষরিকগত বিশিষ্টতার কারণেও যেহেতু কাব্যই ব্যবহারিক প্রতিটি সৃজনশাখার মহার্ঘ নির্যাস, তাই বলা যায়, বিশেষত কবির সৃজনের ইতিহাস তাঁর মৃতুচেতনার বিবর্তনেরই ইতিহাস।

কিন্তু, না, ইতিহাস নয়। এই ঋণ ইতিহাস রচনার নয়। ইতিহাস এক কোলাহলময় অতীত পরিক্রমা। এখন তো নৈঃশব্দ্যের তর্জনী আমাদের দিকে

স্থির। এমন কী টেলিফোনের ঝনঝনানিও ভাঙতে পারছে না এই অরবতা, নতুন করে শঙ্কিত করতে পারছে না আমাদের, কারণ, আর কিছু ঘটার নেই, যা যে কোনো দিন ঘটে যেতে পারত, তা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গিয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এখন ছবি।

স্মৃতি!

কী সহজে, অনায়াসে, অবলীলায় বলা হয়ে গেল কথাটা! স্মৃতি শব্দটির নির্বোধ হাস্যকরতা কি এর আগে এসেছিল আমাদের শ্রবণে!

স্মৃতি কী? তা কি তাঁকে নিয়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সময়, নাকি তাঁরই নিজস্ব যাপন. নাকি উভয়ই, নাকি এসবের বাইরে অন্য কিছু? তাঁরই বলা 'মানুষের কিছু কাজ থেকে যায় মৃত্যুর পরেও' কথাটিকে তবে কীভাবে দেখব আমরা? কীভাবেই বা আমরা দেখব তাঁর 'যদি নেয়' পদ্যটিকে?

'সময় সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছি যৌবনে
এখন সায়াহ্ন, সন্ধ্যা, রাত ঠিক নয়।
কিন্তু, খুব যে বাকি আছে এমনও নিশ্চয়
নেই, তাই যেতে হলে যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না কিছু, যেতে হলে যাবো।
কবিসভাটিতে যারা নেবে বলে আসে
না নিয়ে কখনো যায়, এতোই সহজ!
নিলে, যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না
যদি নেয়!'

দশ পংক্তির এই পদ্যটি ঠিক আধাআধি পর্যন্ত তো এগোচ্ছিল সাধারণভাবেই। কিন্তু আচমকা ষষ্ঠ পংক্তিতে কবিসভাতে নিয়ে যাওয়ার আপাতলঘু প্রসঙ্গ এনে বস্তুত যে উড়ান তিনি দেখালেন, তার সামনে গতিরহিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কী ছিল আমাদের!

অমরা তো জানিই, মার্চ মাসের সেই ভয়াবহ তেইশের ভোরে নতুন দিনের প্রথম পেয়ালা চা শেষ করার কিছু পর তিনি দ্বিরুক্তি না করেই যাত্রা করেছিলেন সেই অরূপ কবিসভার দিকে যেখানে অপেক্ষমান মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ···

মৃত্যু তাই অধিক ব্যস্ত রাখে জীবিতদের। আমরা তাই বইপত্র ঘাঁটছি,

কাগজপত্র ঘাঁটছি, এবং নিজেদের ক্রিয়াপদের এলোমেলো হয়ে যাওয়া কালগুলিকে পুনর্সংগঠিত করে তুলবার জন্য নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছি তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াপদের অতীতকালের সঙ্গে।

একই শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'খুব বেশিদিন বাঁচবো না আমি, বাঁচতে চাই না', এবং 'চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই / শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের / মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই'।

একই শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি' এবং 'অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—কবি ও কাঙাল।'

একই শক্তি চট্টোপাধ্যায় মেনে নিতে পারেননি নাগরিকতার কিছু বৈশিষ্ট্যকে এবং অমেয় উষ্ণতায় ভালোবেসেছিলেন কলকাতাকে।

এই অস্থিতি আর অনবস্থান নিয়েই তো ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন তাঁর সম্পূর্ণতায়, সর্বব্যাপকতায়।

সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাজ সকলের মধ্যে সমবণ্টিত। এবং এখানেই ইতিমধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে এক আশংকা। একটা না একটা নির্দিষ্ট দার্শনিক খাঁচার ভিতরে ঠেলেঠুলে কোনোরকমে আঁটানোর চেষ্টা করা যেন শুরু হয়েছে তাঁর অসীমতাকে। বস্তুত, ক্রিয়াপদের অতীতকালের এই এক বিড়ম্বনা যে এর আগে ও পরে প্রায় যে কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণই প্রয়োগ করা যায় মাথা খাটালে!

থাক সেসব কথা। আশঙ্কার কথা থাক। অভিসন্ধির কথাও থাক। থাক, কারণ, লেখার সময়ে মনের গোপনে কিছু থেকে থাকলেও এখন তো সত্যিই কোনো অভিমান নেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।

আমরা যারা আছি, বিশেষত আমরা, যারা আছি তরুণ বয়সে, এই আমাদের জন্য থাকুক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ঘোষণা—'যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক-মনের মত/তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত' এবং 'আমি ভাঙা গড়ায় মানুষ।'

আর স্মৃতি বলতে থাকুক, কিছুকাল সুখভোগ করার পর এই বসন্তে হল তাঁর মানুষের মতো মৃত্যু।

ভিতরবাগে ময়লা ছিলই না

প্রবীর সেন

ঘড়ি মেলানো নৈকট্যের নিরিখে আমরা ছিলেম দূরমিত্র। শক্তি ও আমি। তিন দশকের সখ্য। দুটো ভাগ—দশ ও বিশের। প্রথম ভাগে নিবিড় সান্নিধ্য, দ্বিতীয় ভাগে সেটা খুবই শিথিল। এই পর্বে দুয়ের-মাঝে ক্ষীণ সেতু রত্না। রত্না আগেই গেছে, সেদিন শক্তিও গেলো। বড়ো বিশ্বাস নিয়ে বলেছিল: একাকী যাবো না অসময়ে। বিশ্বাস মূল্য পেলে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো।

পরিচয় প্রথম কবে, কোথায়, সেকথা আজ আর মনে নেই। অমিতাভর সূত্রেই হয়তো। মোটামুটি যেকথা অব্যর্থ মনে করতে পারি—আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত, 'প্রাচীন সাহিত্য' পত্রিকায় অন্যান্যের সংগেই শক্তিও যখন 'চর্যাপদে'র আধুনিক বাংলা রূপায়নে অংশ নিয়েছে, তখন থেকেই। সেটা '৬৪—'৬৫-র বৃত্তান্ত।

দোষে গুণে মানুষকে গ্রহণের যে সহজ প্রতিভা—ক্ষমতা নয়—শক্তির ছিল, আমার তা সম্ভবত নেইই। ও বোধকরি খোদ শয়তানকেও মৈত্রী থেকে বঞ্চিত করতো না। আমাদের হৃদ্যতার মূলে ওর ভূমিকাই মুখ্য।

মানবসন্তান হয়েও শক্তি অনির্বচনীয় রকমে অকৈতব। ওর অনৈসর্গিক হাস্য ছিল সেই ছলনাশূন্যতারই অনিবার্য অভিব্যক্তি। ধ্বনি ও দ্যুতি সম্পৃক্ত সেই হাসি কবিতার আনাচেকানাচে থাকতেই পারে—কিন্তু, আর কোথাও? ফোটোগ্রাফে দ্যুতিটা বিরাজমান। সর্বোত্তমগুলি যদি নাও হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালে তৈরি তথ্যচিত্রে হয়তো দ্যুতি-ধ্বনি দুটোই এসে থাকবে। এসে থাকলেই—বহু ভাগ্য মানবো।

চৌষট্টি থেকে বাহাত্তর, বছর আষ্টেক, আমরা ওতপ্রোত রকম ঘনিষ্ঠ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। অনেকদিনই সকালটা কাটতো শ্যামবাজার কফি-হাউসে। এখন যেখানে হরলালকার কাপড়ের আড়ত। তখন অনেকদিনই দুপুর-বিকেল থেকে সন্ধে-রাত অবধি আমাদের অতিবাহিত নানা সরাইখানায়। পার্কে পার্কে। তখনো এই শহরের পার্কগুলি এমন ঘৃণ্য ইতরামোর চরম নিশ্চিন্ত ঠেক-

হয়ে ওঠেনি। হামেশাই দৌড় লাগাতেম এক সরাই থেকে আরেকটিতে। বিশেষ অমিতাভ কলকাতায় থাকলে। তখন ছুটির মাস। তাই বুঝি মধুমাস!

তিন দশক পশ্চাতে, ক্রমশিখরাভিমুখি শক্তি হয়তো কয়েকটা মাত্র সোপানই ডিঙিয়ে থাকবে। সেইকালে, কথিত কফি-হাউস থেকেই পরিকল্পিত 'কবিতা সাপ্তাহিকী'। স্বভাবতই সম্পাদক শক্তি। নেপথ্য নির্মাতা মৃণাল দেব। বহুজনার নানাভাবে উপকারী বন্ধু সেই বিচিত্র মানুষটি এখন কোথায়—কী জানি!

বেশ কয়েকটি সংখ্যা তখন বেরিয়ে গেছে। প্রায়ই আড্ডা জমছে ২০১ মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ক্ষুদ্র ডেরায়। এখানেই একদা দীর্ঘকাল বাস করেছেন শতাব্দী-কুরপালা-কাজল স্রষ্টা রমেশচন্দ্র সেন। এবং একাধিক কারণে উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র প্রায় চিরকেলে কার্যালয় ছিল এখানেই। 'শতাব্দী'র মুগ্ধ পাঠক শক্তি।

তখন সেই আড্ডাগুলিতে শক্তির মুখ্য আলোচ্য ছিল—কবিতাকে এরচেয়েও ভালো করে বৃহত্তর মানুষের কাছে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়। দিন দুয়েক অসীম চ্যাটার্জী (কাকা) ও সুদর্শন রায়চৌধুরীও যোগ দেয়—অন্যদের মাঝে। অসীম তখনো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আন্তর-নির্দেশ পায়নি! অন্তত সেই সময়টাতে কবিতা নিয়ে ওদের দুজনের ঔৎসুক্য অল্প দেখিনি। তখন কতো কীই না ঘটলো—কবিতাকে নিয়ে। 'ঘন্টিকী' - অব্দি! আমরা বাঙালিরা পারিও বটে। কালে 'কবিতা সাপ্তাহিকী' উঠেও গেলো।

ওই সময়ে শক্তির সঙ্গে প্রায়ই মীনাক্ষীও আসছেন। ও'দের ইচ্ছে ছিল 'সখী-সংবাদে'র কার্যালয় ২০১-এ করার। কিন্তু জনৈক সঙ্গীর হঠকারিতায় হয়নি। তবে আরেকটা ঠিকানা, সামান্য একটু হলেও, পাকা হয়েছিল। মীনাক্ষীর নিপুণ হাতে সীবিত শক্তির জন্য প্রথম সোয়েটারটির অনেকখানিই এই ঘরে বসেই সম্পন্ন। উলের রঙটা বিলক্ষণ প্রগাঢ় ছিল। ঘটনাটা সবিশেষ যেকারণে আজো ভুলিনি, সেটাই এখানে বলার।

অনেকবারই জামাটা শক্তির গায়ে নানাভাবে মেলে, মীনাক্ষী মাপজোক কষেছেন। আমি নির্নিমেষ কেবল দেখে গেছি শক্তির নীরব নির্মল হাসি। চোখেমুখে দুষ্টুমি। সলাজ আনন্দের সে এক নিঃশব্দ উন্মোচন।

এই সময়েই প্রকাশিত 'মেকঙের হাওয়া'। ভিয়েতনাম সংক্রান্ত বাংলা কবিতার সংকলন। ভিয়েতনাম ফাণ্ডে টাকা তুলবার অভিপ্রায়েই প্রস্তুত।

সত্যজিৎ রায়-চিন্মোহন সেহানবীশের নেতৃত্বাধীন কমিটির মাধ্যমে টাকা যাবে। অন্তরালবর্তী উদ্যোগে, শক্তি-অমিতাভ সহ আমাদের অনেকেরই বন্ধু—বর্ষকাল প্রয়াত চিত্তরঞ্জন পাঁজা। অমিতাভর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সেই প্রকাশক। কাব্য রসিকের বন্ধুকৃত্য। প্রাথমিক ইস্কুল শিক্ষক। যখন মাস মাইনে শয়ের নিচে—তাও হাতে আসে দুতিন ক্ষেপে। সেই অবস্থায় ভাবোন্মাদ চিত্ত সুদে টাকা ধার করেও এগিয়ে এলো। কিন্তু আমরা পরাস্ত হলেম। কপর্দক মাত্রও ফাণ্ডে জমা হলো না!

পরে কোনো একদিন, প্রসংগক্রমে, এই বৃত্তান্ত আগাপাশতলা শুনে অভিভূত শক্তি অপূর্ব একটি ছোট্ট মন্তব্য করেছিল—লর্ড ভাইনাম গ্যালাশিয়া! অমোঘ মন্তব্য। কিন্তু, বিস্তারিত করা সম্ভব নয়—এই লেখায়। দুঃখিত।

এই আপাত-ব্যর্থ সংকলনটি নির্মাণে শক্তির পরামর্শ ও কায়িক আনুকূল্য আমাকে বিলক্ষণ বাধিত করে।

'কবিতা সাপ্তাহিকী' ও 'মেকণ্ডের হাওয়া'র মধ্যবর্তী কখনো—শক্তি-মোহিত অমিতাভ ও আমি—চারজনে সম্মিলিত একটা বিশেষ ইচ্ছে কার্যকর করতে লেগে যাই। শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতার বার্ষিক সংকলন। উভয় বাংলার। বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল। সূচক-বর্ষের মানসে বিপুল পরিমাণ কবিতাও জোগাড় করা হয়। যে যার মতো বাছাই অন্তে, চারজনে মিলেও বারকতক বসেছি। বস্তুত পাঁচজনে। অসামান্য নিষ্ঠা নিয়ে সামিল হয়েছিল সত্য গুহ। এককভাবে সত্যের শ্রমই হয়তো সর্বোচ্চ। সব ঠিকঠাক অবস্থায়ও, সে সংকলন বেরলো না।

পরে কোনো এক প্রকাশনালয় থেকে শক্তি কিছুটা এই ধাঁচার একটি সংকলন সম্পাদনা করে। বোধকরি ওই একবারই। প্রচণ্ড রেগে গিহলাম। অনায়াস প্রতিভায় শক্তি আমার সেই রাগ জল করে ছাড়ে। আর কেউ অতো সহজে পেরে উঠতো না।

'মেকণ্ডের হাওয়া'র ভিতরের কাজ সমাপ্ত। কিন্তু, ভূমিকা লেখানো নিয়েই পড়া গেছে বেজায় ফ্যাসাদে। পশ্চাতে, শক্তিতে-আমাতে পরামর্শ মতো—তিনজনের কাছে গিয়েছি। একেকজন একেকটা বিদঘুটে আপত্তি তুলে আবেদন খারিজ করেছেন। তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কোনো শ্রদ্ধেয় মানুষকেই আমরা সর্বজনীন শ্রদ্ধার আসনে রাখিনি। তখন সর্বাত্মক ঘৃণা বিদ্বেষ সন্দেহের জমাট বিষবাষ্পে গোটা রাজ্য আবিল হয়ে আছে।

চতুর্থ কার কাছে যাই, এই নিয়ে কথা হচ্ছে—আর. জি. কর রোডের সরাইখানায় বসে।

শক্তি বললেঃ এসব সংকলন আর ব্লাড ডোনেশন-ফোনেশন করে কিসস্যু হবে না প্রবীর। স্রেফ ননসেন্স। ভিয়েতনামেই যাওয়া চাই—চল যাবি ?

খুব সম্ভব তখনই ভিয়েতনামে ইয়াংকি বর্বরগুলো নাপাম ফেলছে। চিত্তপটে ভেসে ওঠেঃ ফর হুম দি বেল টোলস, ড. কোটনিস কা অমর কাহানীর স্পেন ও চীন।

বিচলিত আমি বলেছিলাম—'সত্যি বলছিস ?' বেশ খানিকটে রুষ্টভাবেই বলে উঠেছিল—'তার মানে !' কয়েকবার সরাইখানার বাইরেও আমরা এ নিয়ে প্রসঙ্গ করেছি। আমার আরো বিস্মিত হবার ছিল।

একই সময়ে, আমাকে প্রায় হতবাক করে, এরকম প্রস্তাব ভিন্নসূত্রেও এলো। নিঃসন্দেহেই কাকতালীয়। আবার, তখনকার আবহে, সবটাই হয়তো বা নয়।

একদিন শান্তি এসে আবির্ভূত! উপস্থিত বা হাজির না বলে আবির্ভূত বলার কারণ, সুদীর্ঘকাল ও আসতোই না। কেমন যেন একটু চঞ্চলই মনে হলো।

সামান্য কুশল বিনিময়ের পরেই বললে—ভিয়েতনামে যেতে হবে প্রবীর। এখন একমাত্র উচিত কাজ। ঠিক কি না ? একটু হেসেই যেন বলেছিলাম—ঠিক তো একশবার ছেড়ে হাজারবার। সত্যিই যাবে ? শক্তিও একই কথা বলছে। উৎফুল্ল শান্তি শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল ঃ রিয়েলী!

দিন চারপাঁচেকের মাথায়ই শালখে যাই। মাঝে শক্তিও ফের কথাটা তুলেছে। আমিও শান্তির কথা ওকে বলেছি। গঙ্গার পাড়ে একটা সুন্দর মন্দিরের সোপানে আমরা মাঝেসাঝে বসতাম। সেদিনও সেখানেই বসেছি।

—বলো দেখি, কী ভাবলে ?—নিরুত্তরে শান্তি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে, জোয়ারে উত্তাল গঙ্গার পানে নীরবে দীর্ঘক্ষণ তার শান্ত চোখ দুটি মেলে রইলো। যা বুঝবার বিনা বিঘ্নেই বুঝে নিলাম। অনেকদিন বাদে আমার বুঝের সমর্থন শান্তির তরফে পেয়েছি। নিষেধাজ্ঞা!

শান্তির যৎ-সামান্য পরিচয় দেয়া উচিত। শান্তিব্রত মজুমদার। সিটু নেতা চিত্তব্রত মজুমদারের অনুজ। নানাদিকে সত্যকার গুণী হয়ে উঠবার যোগ্যতার অধীশ্বর। স্বাক্ষরও রেখেছে। হয়ে উঠতোই। পার্টি বুঝলে। পরিচিতদের মাঝে, আমাদের প্রজন্মে, জনা কতক কমিউনিস্টের নাম করতে হলে, জড়িমাশূন্য কণ্ঠে সর্বাগ্রে, সেম-ব্র্যাকেটে, দীপেন আর শান্তির নামই সগর্বে উচ্চারণ

করে থাকি। অকথ্য অকালে, অনেকদিন আগেই তারা চলে গেছে। মাত্র সেদিন অগণিত মানুষ চিরবিদায় জানিয়ে এলাম শক্তিকে। চির প্রণম্য অগ্নির কাছে সমর্পিত হলো অনেকের শক্তি।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস শক্তি বেঁচে ছিল কবিতাকে নিয়ে, কবিতার জন্য এবং কবিতার মাঝেই। আমিও সেই বিশ্বাসী দলের মানুষ। অন্যদিকে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আক্ষরিক অর্থে না হলেও, শান্তি পার্টির জন্যই আত্মাহুতি করে গেছে। পরে অনেকবার ভেবেছি, শক্তি-শান্তির যোগাযোগ যদি ঘটাতাম, তাহলে কি আমরা তিনজনে কোনোকালে ভিয়েতনাম রণাঙ্গণে ?

চেতনা আদৌ তা বলে না। বরং বলে, আমরা কস্মিনকালেও সেখানে নেই। সে একেবারে ভিন জাতের মাটি। ভিন্ন মানুষ।

আমরা পৌঁছতাম না। কারণ, আমাদের নেতৃত্ব অথর্ব। সত্যার্থে. সত্যাশ্রয়ীও নন। নেহরু-সুভাষ নেই তো হুন্দার বা অটলও নেই। তখনকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বও বহুলাংশে বলিষ্ঠ বটেই। পরে সবটাই কেমন বদলে গেলো। দিনের পর দিন দেখছি তো !

সীমান্ত গান্ধীর পাখতুন আন্দোলন আমাদের দেখা হয়েছে চিত্তে কিছুমাত্র সাড়া জাগায় না, তিয়েন আন মিনের ঐতিহাসিক বীভৎসা আমাদের বিবেককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এবং অউঙ সান সুকীর তুল্য ইতিহাসকন্যা আমাদের 'নিকষিত চৈতন্যে' নিতান্তই সামান্যায় পর্যবসিত।

নেতৃত্বের সমালোচনায় যতো সত্যই থাক, আপন বিচ্যুতিকেও ক্ষমার্হ মনে করতে পারি না। —শক্তি শান্তির বাঞ্ছিত যোগাযোগ অকৃত রাখার বিচ্যুতি। আসল কথাটা বুঝি এই ঃ আমি যেমন আমার নেতাও হবেন তেমিনই না !

যদিও জানি, শক্তি হয়তো অন্য কোথাও আপন মনশ্চাঞ্চল্যের শান্তি, সুষম নিষ্পত্তি খুঁজে নিচ্ছিল—কবিতার পাশাপাশিই। অবশ্য অনেকখানি নিচের সোপানে। শান্তিকে নিশ্চল করলে তার শৃংখলাবোধ। হয়তো সেই তার মানসিক শক্তির অপরিহার্য উৎস। প্রায় দু দশক পশ্চাতে মস্কো অভিযাত্রী চার কিশোরের 'বিপ্লবী-পরিকল্পনা' মাত্র জলপাইগুড়ি অব্দি পৌঁছেই ফর্দাফাই হয়ে গিছলো—তৃতীয় ব্যক্তিকে হয়তো নিরস্ত করে থাকবে তারি দুর্মোচ্য স্মৃতি। সুতরাং, তিনজনার ভিয়েতনাম যাত্রা ঘটতো না। তা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়তার নিন্দে কে না করবেন।

মাত্র কয়েকদিনের তরে হলেও, শক্তি ও শান্তি প্রবলভাবেই ভেবেছিল যাবার কথা। আন্তরিক চেয়েছিল। সামান্য কয়েকটা দিনই, তবু সত্য এই যে, ওরা আলোড়িত হয়েছিল যতোটা আলোড়ন আমার মাঝে ওঠেনি। উচিত যোগাযোগটা তাই বুঝি না-করেই থাকতে পেরেছিলাম!

সংসারধর্মের প্রায় সবটাই শক্তি পালন করে গেছে। তবু তাকে সংসারী বলাই যাবে না। অনেক সময়ে তাকে এমন কি পরিণতবয়স্ক ও না-ঠেকতে পারে। ওর মাঝে এক চির-বালকের ছিল নিত্য নিবাস। সেই ওকে নিয়ত চালিয়েছে। তাই ও হামেশা এমন কুণ্ঠাহীন। এমন চঞ্চল। এতোখানি দুর্মদ। আশ্চর্য রকম বৈর। শিশু-ভোলানাথের আনমনা খেলায় সাদাকালোর সংসারী ফারাকটা প্রায়শই থাকে ঘুচিয়ে। বিস্তর হুটোপুটি করেছে। ঝুট ঝামেলাও কম করেনি। কিন্তু সবটাই একেবারে বাইরের। ও নিজেই সখেদে উচ্চারণ করেছে : এতো কালো মেখেছি দু হাতে এতোকাল ধরে! আমরা জানি, সে কালিটা পুরোপুরি বাইরের। তিলার্ধমাত্র ময়লা ছিল না মানুষটার ভিতরবাগে।

নাই নাই ধূলি মোর অন্তরে, কথাটা ওর মতো এমন সপাটে বলার অধিকারী আমাদের প্রজন্মে কতোজন! এই খানটাতে শক্তির বিরাট জয়। কালি অচিরেই ধুয়ে যাবে। বিরাটতর কালের মানসে রয়ে যাবে—কবিতার অনবদ্য এক বিচিত্র ঊর্মিমুখর রত্নাকর।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে
নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে এলিজি

মহাদেব সাহা

আমি বুঝি বেঁচে থাকা কী যে ক্লান্তিকর এই পৃথিবীতে
তবুও বাঁচার চেয়ে আর কী আনন্দ আছে কবির জীবনে,
আর কী সুখের আছে দুঃখকষ্টে বেঁচে থাকা ছাড়া
এই ভাঙা বুকে ভালোবাসা, অশ্রুপাত, দু'চারটি পদ্য মেলানো !

হয়তো কিছুই কিছু নয়, তবু এই যে উজ্জ্বল ভোর দেখা
এই যে পাখির গান শোনা, সন্তানের প্রিয় সম্বোধন,
প্রিয়ার মুখের হাসি, তৃষ্ণা পেলে এই জলপান—
একখানি সুরাপাত্র, চাইবাসা, কোলাহল, মগ্ন নির্জনতা ।

এর চেয়ে আর কী সুখের আছে, এভাবেই কিছুটা মঙ্গল
দিন কেটে যায়, সুখেদুখে কেটে যায় কবির জীবন ;
এই কবির জীবন এক অসমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা
জানি নে কোথায় তার শুরু, কিন্তু শেষ তার হবে না কখনো ।

তুমি সময়ের বর্ণ বর্ণমালা টের পেয়েছিলে

(কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়-স্মরণে)

তুষার চৌধুরী

১.

তুমি সেই কণ্ঠস্বর তুমি প্রতিধ্বনি তুমি জলের মানুষ
যখন দর্পণ নড়ে ওঠে
চলে যাও অন্য লোকে যেখানে নির্জ্জন শব্দ প্রহরাবিহীন জন্ম নেয়
তুমি যাও স্বেচ্ছাচারী কিন্তু ইচ্ছেমত
ফিরে আসতে পারো না, তোমাকে ওরা বালিঘেরা দর্পণের পাশে
জেগে উঠতে বলে, ওরা সময়ের পরিক্রমাহীন শূন্যতায়
যাদুপরাক্রান্ত, অন্যলোকে নিয়ে যায়
যেতে যেতে বহু গলি শুঁড়িপথ ভাঙা জানলা বাড়ি চোখে পড়ে
কণ্ঠস্বর লিখে রাখো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে অন্য গ্রহ থেকে
যে-অঞ্চলে মৃত্যুর শাসন, জন্ম. পুনর্জন্ম, ঘুমঘোর
মৃত্যুর প্রণয়লিপ্ত আকুল চুম্বন
তুমি যাও

তুমি স্বেচ্ছাচারিণীর মায়ায় জড়িয়ে পড়ো, পিছু নাও, আর সেই নারী
দেখা দেয় উবে যায় থামের আড়ালে পার্কে মোড়ে জেব্রা-ক্রসিঙে সিঁড়িতে
সাফল্যের মাংসে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বিঁধে আছে
তুমি যাও
তুমি কণ্ঠস্বর আজ তুমি প্রতিধ্বনি তুমি জলের মানুষ
তাহ'লে কি দুরূহ জীবন থেকে, দর্পনের মায়া থেকে
নিজের নারীর কাছে ফিরে আসা ভালো
চক্রাকারে হরমোনকুহকে আনাগোনা
তেমন ভালো কি
তবু কিছু কণ্ঠস্বর, কালো শাদা সিঁদুরে সবুজ ও বেগুনি
সন্ততির জন্য রেখে যাও
তুমি প্রতিধ্বনি তুমি জলের মানুষ

হৃদের গভীরে এক চমৎকার ভাঙাচোরা
নির্জন বৈঠকখানা পেয়ে গ্যাছো
এখানে স্বপ্নের দাম কানাকড়ি, গোধূলির জলের কিনারে
ছুরি চাবি রুমালেরা নিজেদের খসে পড়া দেখাবে যে কারে !
এখানে একটাই ঋতু, মধুঋতু, কিন্তু নারী নেই
এখানে একটাই বেলা, সন্ধেবেলা, চিরসন্ধেবেলা
এক দুই তিন করে বন্ধুরাও চলে আসতে পারে

২.

হাওয়ায় বুনেছ বাসা, হে বাবুই, নীলিমার অরণ্যের ডাকপিওন তুমি
আরামকেদারা বহু ব্যবহার হ'ল, আজ মনে হয়, এসবের কোনো মানে ছিল
আঙুল, আগুনপাতা, তৃষ্ণার মুখোশ
এসবের কোনো মানে ছিল ?
জলপাতালের মণ্ড অগ্নিময়, শূন্যতার জননীনক্ষত্র
আলো আসে
তোমার বিবাহ বুঝি ?
কবিরা আতসবাজি পোড়াবে অনেক
কবিদের সান্ত্রীরাও
আকাট হুল্লোড়বাজ বরযাত্রীরাও
বিবাহ বিবাহ, এই যাদুহীন যুগে ও হুজুগে
লেখা হবে কিছু কিছু পরিপ্যাটি মিস্টি কবিতা
অভিমানভরা ফুলে গাঁথা হবে ঠুনকো মালা
এসবে তোমার আর আগ্রহ হবে কি
হে স্তব্ধ নীরব বর
তার চেয়ে তোমার কন্ঠ, গাঢ় ও মদির কণ্ঠস্বর
শুনি, শোনা ভালো

শক্তির জন্য দুটি কবিতা

নওল

(নওল একজন প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাবি কবি। মূল কবিতা থেকে অনুবাদ করেছেন রমা ভার্মা)

১.

শক্তি ! আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি
চায়ের নিংড়ানো পাতার মতো
একটি লম্বা আঁখ আমারি চোখের সামনে পেষিত হচ্ছে
পেষিত হচ্ছে বার বার
তারপর রাস্তার একধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার ছিবড়ে
তোমার এই দেহ তুমি ছাড়া—আঁখের ঐ ছিবড়ের মতো

অনন্ত আশায় আমার অন্তর থাক ভরা
আমার স্বপ্ন আমার পদক্ষেপ করে নিয়ন্ত্রণ
পৃথিবীকে বদলে দেবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের করে দৃষ্টিদান
আর করে দান তিরষ্কার উপেক্ষা সহ্য করার শক্তি
কিন্তু শক্তি !
আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম
তুমি আমার চোখে নিজের দেহ
এবং সেই দেহের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে দেখে
দেখতে পাবে
যে এই শহর, এই দেশ, এই পৃথিবী
কোনো সম্পূর্ণ মানুষকে ধরে রাখার জন্য সৃষ্টি হয়নি
নিজের দেহ ছেড়ে যাবার আগে
তুমি কি এই চিন্তাই করেছিলে
যারা তোমার মনে-মস্তিষ্কে
হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে
তাদের ধিক্কার দিয়ে
কোথাও কোন দিকে চলে যাবে।

শক্তি! আমি সত্যিই নিঃস্ব হলাম
তোমার মৃত্যুর খবর পড়ে
আমি তোমার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলাম
কিন্তু মনে হল
এই প্রার্থনা যেন সেই রকম
যে রকম উচ্ছিষ্টের ওপর কাকের ঠোকরানো
শক্তি, আমি নিজের প্রার্থনা কামনায় রিক্ত হয়ে গেছি
কারণ যে কোনো প্রয়োজন
আসলে বদলে যায় প্রয়োজনের দীনতায়
আমায় জানা নেই শক্তি তুমি কোথায়
কিন্তু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি
সেই জায়গায়
অপরিচিত বিষাদের স্বাদ পাচ্ছি আমি।

২.

মৃত্যুর ওপারে
কোনো দেহাতীত খবর থাকলে আমাকে জানাও শক্তি
আমি অবিকল
শব্দের চাদরে না ঢেকে
এই ধরিত্রীর বাসিন্দাদের দিয়ে দেবো
আমার বাড়ির সামনে একটি খালি জমি পড়ে আছে
কিছুদিন আগেও
পাড়ার ময়লা ফেলার আস্তানা ছিল সেটি
এখন সেটি জঞ্জালমুক্ত
নতুন একটি বাড়ি তৈরি হবে সেখানে
যেদিন থেকে তুমি চলে গেছ
সেখানে একটি বেড়াল বসে থাকে
ও ডাকে না পর্যন্ত
শুধু সারা রাত্রি ধরে
আমার সঙ্গে জেগে থাকে

আমি বুঝে গেছি যে বেড়ালটি
আসলে আমার-তোমার মাঝে দূতের কাজ করে
তোমার চোখে ছাগশিশুর কাতরতা
যা সর্বক্ষণ নিজের বধের প্রতীক্ষায় থাকত
তুমি কি সারা জীবন নিজের বধের জন্য
প্রতীক্ষারত ছিলে ?
আমার চোখে স্বচ্ছ মুক্তা বিন্দু
কিন্তু তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি
যে তুমি তোমার সমকালীনদের
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছ
যেন বলছো দ্যাখো আমি চললাম ফিরে না আসার জন্য চললাম
কবিতায় যেমন নিজের পথ করে নিয়েছি এবং দেখিয়েছি
ঠিক সেই রকম মৃত্যুর ওপরে নদীর ধারের জঙ্গলে
আগুনের চাষ করে বলেছি
যার শোক হবে, সে যেন আমার পদচিহ্ন ধরে চলে যায়।

চৈত্র-ভোরের কান্না

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চির-বিচ্ছেদে)

কৃষ্ণা বসু

অরণ্য অগ্নির মতো এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে,
ভোররাতে মৃত্যু এসে চুরি করে নিয়ে গেছে প্রিয় কবিটিকে।
রঙিন পাগল কবি, বর্ণকারুকার্যময় বেঁচে থাকা তাঁর,
দৈব পিকনিকে এসে মহোৎসবে সবান্ধব মেতেছে দুর্বার।
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অগ্নি এসে খেয়ে নিচ্ছে মেধার অপার ;
চিতার আগুন এসে লক্ষ জিভে শুষে নিল রহস্য-পাথার ;
মর্মছেঁড়া ব্যথা মেখে আমরা সকলে নীল, চেয়ে আছি চুপ,
প্রথমে প্রণাম করে কোলে তুলে নিল তাঁকে চিতা অপরূপ।

হেমন্ত অরণ্য বেলা, ঝরাপাতা, পোষ্টম্যান ঘোরে একা একা,
অতল খাদের পাশে মোহন মৃত্যুর সঙ্গে অতর্কিতে দেখা !
বার বার গৃহস্থ-আমোদ ফেলে ভেঙে দিয়ে রুটিনের বেড়ি,
অনিয়মে অরণ্য দুর্গমে গেছে ভুতগ্রস্থ কবি স্বেচ্ছাচারী !
এই ডাক নিশিডাক, অবশেষে শেষরাতে ডেকে নিল খাদে,
চৈত্র ভোরে টেলিফোন কেঁদে ওঠে আকস্মিক শোকের সংবাদে !

পলাশ করেছে কাল

[কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণে]

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

ছন্দোভাঙা পুরোনো বারান্দা যেন
বহুকাল জনহীন,
লালমাটি ভুবনডাঙায়
মতিচ্ছন্ন পলাশের দিন।

মান্ধাতা বটের শাখা
আলুথালু ঝুরি নিয়ে
দেখে গেল স্থির দুটো চোখ···
সারাদিন অবুঝের মতো তবু
কেঁদেছে অশোক,
বেনামুলে নাম তার রেখে গেছে
আগুনে অক্ষরে—
যতদিন ফুল ফোটে
যতদিন বৃষ্টি ঝরে মেঘ থেকে···
আমাদের প্রেমে আজও বেঁচে আছে বলে
বিষাক্ত ফুলের থেকে
ফোঁটা ফোঁটা ক্ষরে পড়ে মধু,

মাদার পরিয়ে দেয় লাল কিরীট
দিগন্ত দিনের ফাঁকে ফাঁকে ।
এই ছন্দ,
এই গতিময়
বসন্ত শেষের মধুর প্রবীণ বাতাসে—
অসংশয়িত ছিল
তোমার স্বচ্ছন্দ দিনগাথা ।
কথা দিয়েছিল জ্যোৎস্না,
অগ্নিশীর্ষ বিজয়কেতন
কথা দিয়েছিল লাল পলাশেরা—
'তোমায় আখর হব প্রতিদিন ভোরে ।'
'পলাশ ঝরেছে কাল'
এই বার্তা বেনামূলে, ঘাসে—
'ভুবনডাঙার ঢালে
খসে গেছে পলাশের উর্ণা
ভোর রাতে কাল ।'

ঝিমোয় মান্ধাতা বট
বিপ্রলব্ধা কন্টিকারিটির
আকীর্ণ কাঁটায় বেঁধা হিমকণা দুটি
মুছে নিয়ে উড়ে গেল
ক্লান্তপক্ষ দূরের তিতির ।

ছত্রখান কবিতার ঘর-দুয়ার

['সোনার মাছি খুন করেছি'র কবিকে]

অজিত বাইরী

চোরাবালির উপর হাঁটা যায় না, এ-কথা বুঝতে চাননি সারাজীবনেও। ছিলেন বেপরোয়া, উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী। সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী, গৃহী হয়েও ভবঘুরে। কবিতার কাছে সর্বস্ব পণ ক'রে বসেছিলেন, অথচ সে হতচ্ছাড়ি তাঁকে একতিল সুস্থিরতা দেয়নি কখনো। উড়োপাতার মতো আজ এখানে, কাল সেখানে। নিজের প্রতি দয়ামায়াহীন; যেন প্রতিশোধ নিতেই তাঁর জন্ম। কার প্রতি প্রতিশোধ? হয়তো নিজেও জানতেন না। বারুদ মুখে ছুটে গেছেন দুপুরের গরম হাওয়ার মতো। তছনছ করতে চেয়েছেন বালকসুলভ দৌরাত্ম্যে। সুন্দরকে চুরমার ক'রে গড়তে চেয়েছেন সুন্দরের মূর্তি। পৃথিবীর এককোণে একটি ঠাঁই ছিলো তাঁরও। সে গৃহের প্রতি মমত্বও ছিলো। কিন্তু বাঁধন ছিলো না। যখন যেখানে সেখানেই কবিতার চিত্রকল্পে সাজানো তাঁর ঘর। নিজেকে নিজেই নির্যাতন করেছেন জীবনভর। চোরাবালির উপর হাঁটা যায় না—বোঝেননি কখনো। বুঝতেও চাননি। সময়কে তুড়ি মেরে চলে গেলেন অক্লেশে। ছত্রখান হয়ে রইলো কবিতার ঘর-দুয়ার।

শুধু বিষণ্নতা নয়

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়-স্মরণে)

নন্দিতা চৌধুরী

বহুদূর প্রবাসে
তুমি আজ বসে আছো পরিচিত এক ধান ক্ষেত ছেড়ে।
সেখানে শাল, সেগুন, আমের মঞ্জরী আমাদেরও আগে
তোমাকে বিমুক্ত করে, এবার অকালবৃষ্টিতে
বিকেলে রোদ্দুর পোহাতে আসে।

নৌকোয় উঠলেই বুঝতে হাঁসেরা
কি ভীষণ বদলে গেছে মেঘের প্রণয়ে।

শ্মশানযাত্রীদের সেই সব এলোমেলো বুদ্ধিমান হাসি
ওই সব দেশে পাবে না, পাবে না পর্যটনময় অসংখ্য
বাতিঘর, কোন এক দেয়ালির রাতে।
এখন ভালোবাসা তাই তোমারই ফুলের বাগানে
তোমারই সান্নিধ্য আর স্বপ্নের ভিতরে।
অজানা নক্ষত্রের শস্যক্ষেত জুড়ে পড়ে আছে হেমন্ত খামার।
তাই মৃত দেহে শুধু বিষণ্নতা নয়—
প্রয়োজন তোমাকে যে আমার
মেঘেদের অন্তিম নুপুরে তখন মুমুক্ষু মুখ
আমি দেখেছি অনেক।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু

সব্যসাচী সরকার

আজ এই বাংলাদেশে বাতাসে ওড়ে কান্না ভেজা নিউজ পেপার চৈত্রের দিনে। অর্থাৎ প্রথমত যা অবিশ্বাস্য, ক্রমে ক্রমে তাই বিশ্বাস ও ককিয়ে ওঠা কান্না। এক তীরন্দাজ তূণীর ও গাণ্ডীব রেখে চলে গেছে, আর আশেপাশে যারা সহযোদ্ধা, সেই সময় তারাও ভুলে গেছে কি করে তীর ছুঁড়তে হয় কি করে বাঁধতে হয় ছিলা···

প্রথম যখন রাস্তা পার হই, তখন তোমার মুখের ছবির, তারপর অক্ষরের ওপর অক্ষর আঁকড়ে ধরে রেখেছে তোমার মৃত্যু সংবাদ···সেই সময় তোমার কলকাতা এক মিনিটও নীরবতা পালন করেনি, বাসের গায়ে বাস, মানুষের গায়ে মানুষ, খিদের গায়ে খিদে. আমরা থেমে গেছিলাম। ভুলেই গেছিলাম কে আমার প্রতিবেশী, কারা বন্ধু, কারা শত্রু, অথবা কে বোবা ও পাগল···
টলতে টলতে ঘন সন্ধ্যার রাস্তা পার হচ্ছি, বিচ্ছিন্ন আমাদের কেউ চেনে না। শুধু বহু পুরনো এক শত্রু বললো, 'শুনেছো, শক্তিদা নেই'
এর মধ্যে এক বোবা আর্তস্বরে কেঁদে উঠল. তার প্রথম কথাই বোধহয় তুমিই ছিলে···এর মধ্যে এক ফ্যাসিস্ট, এক দাগী আসামী, এক দালাল-নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো, 'হায় হায়-কবি নেই।'

এরা সবাই তোমাকে কেমন চিনতো, তুমিই জানতে। তুমিই শুধু জানতে
কেন থাকো বললেও কিভাবে যেতে হয়।

আর তারপর চৈত্রের ধুলোঝড়, কলকাতার ভুল ফুটপাতে ফোঠা পলাশ কাঁদলো,
যেন এইমাত্র তারা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছে,
ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো ঝাপসা চোখ, খালি মনে হল আরো আরো লোক
কেন পাশে দাঁড়িয়ে বলছে না, তুমি নেই··· আমি আপ্রাণ বিশ্বাস করতে চাই-
ছিলাম, তুমি নেই···

আরো পরে এক ভোর হল, সে কেমন ভোর, যা জীবদ্দশায় তুমিও দেখোনি ?
আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই ভোর দেখতে থাকলাম, যেন কতদিন এমন
নিঃসঙ্গ ভোর দেখিনি বিশ্বাস করো, দেখবোও না আর কোনদিনও···

আজ মৃত্যু, আজ মৃত্যুর অধিক

(শক্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু)

প্রবীর ভৌমিক

ধনুর ছিলার থেকে ছুটে গেছ অব্যর্থ মৃত্যুতে।
'সুদর্শন পোকা' তুমি কাছে আনালে না দূরের চিঠিকে
অন্তত বিপুল ক্লান্ত আমাদের শান্তিনিকেতনে।

করোটিতে সেই রাত্রে বিষ জমেছিল !
নিদ্রাহীন ছিলে তুমি ভুবনডাঙায়
পাথরের থেকে মুক্তি পেতে
কবিতার জরায়ু কাঁপিয়ে কোনো দুর্মর সৃষ্টির জন্য
শেষ রাত্রে মৃত্যু সে কি ছিল স্বাভাবিক !

রাজপথ জুড়ে আজ আনন্দ ও শোকের মিছিল
ভীতু গ্রাম, কাপুরুষ শহর ছাড়িয়ে আগুনের দিকে
গানে গানে চলে যাচ্ছে রাজকীয় কবির শকট।
দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘতম এই অগ্নি সহবাস-শেষে
জন্ম নেবে কবিতার একরোখা, অবাধ্য সন্তান।

অগ্নিও পৌরুষ চায়, অগ্নিকুণ্ডে প্রকৃত পৌরুষ রেতঃপাত।
তোমার অধিক যোগ্য আর কেউ নেই বলে
আজ এই অগ্নিভ আহ্বান।
আজ মৃত্যু, আজ মৃত্যুর অধিক এক চূড়ান্ত সঙ্গম।
রাজপথ জুড়ে আজ আনন্দের শোকের মিছিল।

চলে যাওয়া

নীরদ রায়

এই চলে যাওয়া কি কেবল
বুক অবধি আগুনে পুড়ে যাওয়া ছাড়া, আর কিছু নয়?
দুঃখকে সারারাত বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখেও
মাথার ভেতর ক্রমাগত কিলবিল করে বেড়ে যায়
দুঃখ-বিষয়ক কয়েক গুচ্ছ অপাঠ্য শাদা কালো,
এছাড়া আজ এই ম্লানমুখী মফস্বল শহরে
নিজেকে প্রকাশ করার আর কোনো ভাষা নেই, পরিচয়ও নেই,
চলে যাওয়া কোনো আশ্চর্য নয়, তবে অসময়ে তৈরি থাকে কে?

শোক তাই আজ নিজেই শুনিয়ে গেল তিনচারটে নতুন কবিতা,
আকাশের লোভনীয় অংশটা হঠাৎ ভেঙে পড়লো কুলীকের জলে
জলে কি কোনো প্রসঙ্গ থাকে জীবিত?
যেভাবেই হোক এই শূন্যতাকে আমরা ঘেঁষতে দেব না কাছে
আর এই চলে যাওয়াকে ঘরে তুলবো না কখনো।

শক্তি চাটুজ্যের নামে

তরুণ সান্যাল

সেসব দিন তো চমক ছিল পাথর পথে কাঁটায়
পায়ে বিঁধলেও রাত বিরেতে মাঠ বরাবর হাঁটাও
মাথার মধ্যে তিল বেতল টলমলানো নেশায়
গেলাস বোতল না ছুঁয়েও তো বেতাল রসও মেশায়
রাখাল তা'পর রাজা হলেন মন্ত্রী গুজুর গুজুর
আমলাফয়লা নায়েব নকিব মুরুব্বি জী-হুজুর
কবির ঘাড়ে চায় চড়াতে তকমা-আঁটা জোয়াল
রাজপুত্তুর চায় মাথা হোক খসখসানি পোয়াল
নদীর জলে আঁস ছিল সোঁদাল সোনায় মোকি
এসব দেখে কখন ফুড়ুৎ শক্তি চাটুজ্যে কি ?

বাঁধা গোরুর কমতি ঘাসের খবর লেখা-দড়ি
ছিঁড়ে সেলেট উল্টে মুছে কখন হাতে খড়ির
বনবাদারে পাহাড় টিলায় বর্ষা এবং শুখায়
স্যাত হাটুরের দা-কাট্ তামাক পেটভাতা না ভুখায়
টানতে টানতে চলে গেলেন বাঘের রাগের বসত
প্রেমের কাঙাল, সঙ্গে ছিল কলম কালির রসদ
শমন-দমন রাবণ রাজার ঘাড়ে রাখেন হাত
রাত পেরোচ্ছেন দিন পেরোচ্ছেন মৌতাতে মৌতাত
এদেশ সেদেশ মানুষরতন জানার নানা জের
না মিটতেই সাক্ষী সময় শক্তি চাটুজ্যের

ঘর জ্বালানি পর ভোলানি রঙচটাএকদেশ
হয়তো তাসের হরতনীদের ভোলালো শেষ মেষ
কবির কিন্তু পা মাটিতেই কপালে সেই ফোঁটাও
আর অভিষেক শেষ না হতেই চেয়ার ছেড়ে ওঠা
আমিও তাঁর মধ্যে ছিলাম আমার মধ্যে সে কে
এক প্রজন্মে মারী মড়ক ফ্যান দে মা দেশ দেখে
হঠাৎ কখন মনের ভূগোল করাত চেরা হাঁ-র
কেবল ভাষার মিল খুঁজে পাই এপার ওপার মা-র
আগুন ছিল সে ঘাম দিলো বাউকুড়ানী হেঁকে
সময় কিছু ফুল দিয়ে খায় শক্তি চাটুজ্যেকে ।।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার নিবিড় পাঠ

আশীষ মজুমদার

চাবি ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার কাছে এখনও পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো ?
থুৎনি-'পরে তিল তো তোমার আছে
এখন ? ও মন, নতুন দেশে যাবি ?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।
চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?
অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কি না ?
[কাব্যগ্রন্থ ঃ ধর্মে আছো জিরাফেও আছো
প্রথম প্রকাশ ১৩৭২]

হঠাৎই লেখা এই চিঠি, যার কাছে, তার প্রিয় চাবি হারিয়ে গিয়েছিল, পত্র লেখক সে-চাবি পরম যত্নে রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে, আজ সময় হলো, হঠাৎই সময় হলো, জানতে চাওয়ার যে, চাবিটা, চাবিটার মালিক ফিরৎ চায় কি না। সময় যখন হয়েছে তখন চিঠি লেখাটা হঠাৎ কেন ? সেদিক থেকে চিঠি লেখাটা যথাসময়তই হচ্ছে, কিন্তু সেই সময়টা হঠাৎ হয়েছে মনে হয়। কিংবা সাধারণত চিঠি লিখিনা, কিন্তু হঠাৎ চিঠি লিখতে হল।

আমি বলতে চাইছি যে, চিঠি কবি লিখছেন, 'চিঠি তোমায়' হঠাৎ লিখতে হলো' আবার লিখছেন 'আজই সময় হলো' আবার লিখছেন, 'আজই সময় হলো—এ দু'য়ের মধ্যে তো কেবল এভাবেই সামঞ্জস্য করা সম্ভব, যদি অবশ্য সামঞ্জস্য খোঁজাটা জরুরি হয়।

এই জানতে চাওয়ার মধ্যে একটা ফয়সালা করে নেবার মনোভাব আছে বলে মনে করি। প্রিয় চাবি পত্র লেখকের কাছে রাখা আছে একথাটা বুঝি মহিলার জানা নাই, না হলে 'হারিয়ে যাওয়া' বলা হবে কেন চাবিকে? অর্থাৎ চাবি পত্র লেখক নিজের কাছে, খানিকটা চুরি করেই, রেখেছিল যত্নে, আজ হঠাৎই সেটা জানানো উচিত বলে মনে হল আর জানতে চাইছে যে, সে-চাবি 'ফিরৎ চাহো কিনা?'

অন্যের চাবি চুরি করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া, যে-সে চাবি নয়, তোরঙ্গ খোলার চাবি—ব্যাপারটা যেন একটু অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। এ কি সেই স্বপ্ন লোকের চাবি, যা কেউ চুরি করে নিয়ে যায় আর জেগে জেগে ভাবতে হয় 'কেউ নিয়েছে চুরি করে স্বপ্ন লোকের চাবি?' এভাবেই চাবি নানার্থব্যঞ্জক বলে মনেহয়।

যদি চুরি যাওয়ার কথা না ভাবা হয়, তাহলে ভাবতে হয়, যে-চাবি তার প্রিয় ছিল, আজ হারিয়ে গেছে ভেবে উদাসীন 'হয়ে গেছে' পত্র লেখক সেই সম্পর্কের চাবি যত্নে রেখেছিল। আজ জেনে নিতে চাইছে ফিরৎ চায় কিনা। কিন্তু আগের পাঠটাই আমার অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

হারিয়ে যাওয়া চাবি আমিই যত্নে রেখে দিয়েছি একথাটা হঠাৎ জানানোটা উদ্দেশ্যমূলক এবং সে ফিরৎ চায় কি-না জানতে চাওয়াও উদ্দেশ্যমূলক। যে-চাবি তুমি হারিয়ে গেছে ভেবে প্রাণপণ খুঁজছ, কারণ তোরঙ্গ খুলতে পারছ না, জেনে শুনেও আমি ফিরৎ দিচ্ছি না একথা জানানোয় 'তোমার' প্রতি বিশেষ মনোভাব প্রকাশ করে দেওয়া হয় আর সে-চাবি ফিরৎ পেতে না চাইলে সেই মনোভাবকে তুমি সমর্থন করবে আর ফিরৎ চাইলে তাকে বর্জন করতে চাইছ বুঝব।

অর্থাৎ, চাবি যত্নে রেখে দিয়ে একা একা ভালবাসায় পুড়তে থাকা শেষ করে দিয়ে একটা ফয়সালায় পৌঁছতে চার লোকটা, জানাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে বোল্-ড্-লি 'চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে রেখেছিলাম' আর জানতে ও চায় বোল্‌ড্‌লি 'লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' পরে এই 'চাবি' আর 'অশ্রু ঝলোমলো' মুখের স্মৃতি একাকার করে দেওয়া হয়।

এ কবিতার নায়ক প্রেমিক আবার সন্ন্যাসীও। এই পৃথিবীতে যে এসেছে 'অবিরাম ভেসে থাকতে অস্তিত্ব ভাসিয়ে রাখতে শুধু' (আজ আমাদের ঘর নাই, আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে' নামক কবিতা থেকে)। তার স্মৃতিতে যে থেকে—

গেছে, 'একটি মুখ অশ্রু ঝলোমলো', সে তো সে প্রেমিক বলেই, আবার সেই স্মৃতিকে সে 'অবান্তর' বলার সন্ন্যাসও অর্জন করেছে। সেই স্মৃতি মুখের স্মৃতি, যার মুখ সে ফিরৎ চাইলে স্মৃতিভারাক্রান্ত লোকটা ফিরিয়ে দিতে পারবে কি? ফিরিয়ে দিতে পারবে কি তাদের সম্পর্কের সেই চাবি? হতে পারে, না ও হতে পারে, কিন্তু মনে হয় এই জানানোটাই জরুরি তোমার মুখ, যে মুখের থুৎনিতে তিলটা আমার মনে আছে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে রেখেছি আর জেনে নেওয়াটাও জরুরি তুমি কি ফিরৎ নিতে চাও? না কি স্মৃতিতে বহন করার প্রশ্রয়টুকু দেবে?

শক্তির কবিতার প্রেম স্মৃতি ভারাতুর। যেন অনেকদিন আগের ঘটনা সেইসব ভালবাসা। 'হৃদয়পুরে জটিলতর ছেলেখেলা' ফুরায়েছে বহুদিন। থুৎনিতে তিল আছে কি না এখন, একথা জানতে চওয়ার মানে তো এটাই—এতদিন এতদিন হয়ে গেছে যে বদলে যেতেও পারো তুমি, মুছে যেতেও পারে থুৎনির সৌন্দর্য চিহ্ন 'থুৎনি পরে তিল তো তোমার আছে এখন?' 'কিংবা এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে যার আরেকটা জিজ্ঞাসাও, এখনও কি তেমনি সুন্দর আছ তুমি?'

শক্তির কবিতার কেন্দ্রে থাকে ভালবাসা। কিন্তু ছেড়ে চলে আসতে পারার এবং ছেড়ে চলে যেতে দিতে পারার সক্ষমতা নিয়ে ভালবাসা। থুৎনির তিল নজর করেই, নতুন কোনো দূর দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে 'সাহস দিচ্ছে।'[২]

জীবনের প্রতিও একই প্রকার তার, তাই সে লিখেছিল "এই যে দুটা ধরনের অবস্থা—সবকিছু ছেড়ে চলে যাওয়া আবার জীবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ানো এই বোধ থেকে বলে ওঠা "যেতে পারি যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু কেন যাবো?[৩] এর মধ্যে একটা আলগা ভাব রয়েছে, উদাসীনতা কাজ করেছে। যতই সামাজিক হবার চেষ্টা করি আসলে মূলে রয়ে গেছে একটা ছন্নছাড়া প্রভাব।' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বগতোক্তি 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব'—পদ্যবন্ধ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৯১।) স্মৃতিতে রাখা আছে, অনেক অদেখা সত্ত্বেও, মুখখানা অশ্রু ঝলোমলো, 'অশ্রু ঝলোমলো' শব্দ ব্যবহারে যে-মমতা, যে-আসক্তি ওকে ভেঙে দিয়ে তীব্র উচ্চারণ 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' ফিরৎ চাইলে দিয়ে দিতে ও পারি, 'যেতে পারি।'

কবিতাটা শক্তির প্রিয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দ দলবৃত্তে লেখা। কিন্তু 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা'—এই চরণকে প্রবল গুরুত্ব দেবার জন্যই প্রথম পর্বে পাঁচটি মুক্তদলের সমাবেশ। মাত্রা সংখ্যা চার রেখে শক্তি লিখতে চায়নি 'লিখো

উহা,' প্রথম পর্বে পাঁচ মন্ত্রদল, সাধু ক্রিয়াপদের ধাক্কায় চরণটা জ্বলে ওঠে। কারণ ঔদাসীন্যটাই; সমস্ত ভালবাসা সেন্টিমেন্টের মধ্যেও, ঔদাসন্যটাই শক্তির কবিতার ঐশ্বর্য, 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' কাব্যকে সন্ন্যাসের চর্চা ভাবতো, গদ্যকে বলেছিল 'গার্হস্থ্য।'

শক্তির কবিতার মিল, অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিল বিশেষ গুরুত্ব তৈরি করে তার কবিতার, অনেক সময় ওর জোরেই কবিতাটা হয়ে ওঠে, অনেকসময় মিল দেওয়ার চমৎকারিত্বেই কবিতাটা লেখা হয়ে যায় তার কিংবা কোনো শব্দ 'খরচ' হয়ে যায় মিলের মজায়।

চার স্তবকের দ্বাদশপদী এ পদ্য কবিতায় মিলের বিন্যাস ক খ গ ক খ গ ক গ ঘ ক গ ঘ। 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা'—তেই আসে নতুন মিল তার জোরেই আবার হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতম চরণ।

কবিতাটায় প্রথম চরণ ছাড়া আর কোথাও অন্তর্মিল নেই।

কবিতার ছবি ছবির কবিতা

প্রদীপ পাল

'সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার'—নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, কোন বিষয়প্রতিমাকে কেন্দ্র করে কবি কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। যৌবন অন্তে প্রৌড়ত্বের সন্ধিক্ষণে কবির ফিরে তাকানো, স্মৃতি ভারাতুর অতীতের দিকে। গ্রন্থ শিরোনাম প্রকারান্তর ইঙ্গিত। অগ্রিম আভাস। শব্দের নির্মাণে, বলার ভঙ্গিতে গদ্যের কাছাকাছি; অথচ পাঠে তা কবিতাই। চিত্রার্পিত কবিতা। সংযুক্ত নাটকীয়তাও! কখনো তা প্রেমের জটিল অথবা সুমধুর সম্পর্ককে ঘিরে। কখনো প্রকৃতি প্রেমের পর্যটনে। টান টান সটান প্রতি কবিতার ছত্রে ছত্রে।

দিনগুলো সেই স্মৃতির ঘোড়ায় ছুটছিলো আর ছুটছিলোনা
কখন কোথায় থামছিল তার নিজের ঘোরে
থামছিলো আজ মাঝ-সড়কে, কাল থেমেছে গাছের নিচে
আগামীকাল থামবে, নাকি থামবেনা—তা তার অজানা।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ত কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত ১৯৮৬ সালে। পাঁচটি কাব্য নাটক বা সংলাপ নাটক এবং সাতটি দীর্ঘ কবিতার সমাবেশ এই গ্রন্থে। কবি এখন প্রয়াত। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে বুঝিবা কিছুটা বিশ্রামের প্রয়াস। আলোচক নবীন। তারই ভাষায়—'নওল বালক'। অথচ তাকেও কলম ধরতে হয় অগ্রজের জন্য। বিষয়টি আনন্দপ্রদ নয়। নয় দুঃসাহসিকও।

কাব্য গ্রন্থটির ভূমিকায় যে কটি কথা বলা হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ বলা হয়েছে ঃ কবিতা ও গল্পের মধ্যবর্তী দেওয়ালটা ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে—একথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের আঙুল আসলে নিবদ্ধ থাকে সেইসব গল্পের দিকে, আত্মার দিক থেকে যা-কিনা কবিতার সমধর্মী। কিন্তু এর উল্টোটাও যে সত্য হয়ে উঠতে পারে, গল্পের বীজ থেকেও যে ফোটানো যেতে পারে কবিতার স্বমহিম ফুল, সেই পরীক্ষারই বহুবর্ণ কিছু নমুনা এবার তুলে ধরলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

—বাইশ বছর পর দেখা হলো, সুতপা, আবার
কবে দেখা হবে ?

—তুমি বলো
—এলে দেখা হবে, যদি ডাকো
চিতা থেকে উঠে আসবো
যদি তুমি ডাকো
—কাজ থেকে ?
—কাজ থেকে আসবো অকাজে
আজকে সন্ধ্যার মতো।
তুমি ভালো থেকো।

"বাইশ বছর পরে" দীর্ঘ কবিতাটি শেষ হয় এভাবেই। সেটি সহ "একা গেলো", "একাকী"; "স্বীকারোক্তি"; "জন্মদিনের মঞ্চে"—সংলাপ কবিতা। যেখানে মানুষ-মানুষীর ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সম্পর্কের জটিলতা। অবলীলায় বলে যান কবি শক্তি। "একাকী" কবিতায় কবি প্রকৃতি সচেতনও। উপমা ঃ 'দেবদারু-বীথির ছল ভেঙেছে উইলো ও সিলভার ওক। / ঝাউ ইতস্তত, আছে নানান ক্রোটন, নেবু ঘাস··· / মাঝখানে পথ গেছে দুপাশের কবর সাজিয়ে / দেয়াল পর্যন্ত, মানে আধ মাইল নিস্তব্ধ দুপুর। / রঙিন ঝিঁঝি ও প্রজাপতি বসে ফুল ও পাতায় / দুরন্ত পাখায় করে ব্যতিব্যস্ত মৃতের ময়দান···।' এরকম প্রকৃতির চিত্র শক্তি অহরহই এঁকে ফেলতে পারেন অক্ষর সাজিয়ে। যেমন ঃ 'তামা ও ভরণে নেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে / আবীরে গুলালে নেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে। আমাদের দুজনের দুটি হাত ধ'রে অমাদেয় দুজনের চার হাত ধ'রে / জ্যোৎস্নার ভিতরে টানে।' (আবার দোলের দিন, দু দশক পরে) বা 'গাছের ভিতরে কিছু ভেদাভেদ আছে। / শালের জঙ্গলে নেই অন্য কোনো গাছ / তা কি শুধু শোভা, শুধু সৌকর্য একক / নাকি শাল অন্য কোনো সংস্রবে বাড়ে না / একাকী জঙ্গলে বাড়ে, মরেও একাকী।' (ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে)। নগরের ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন এভাবে ঃ 'সামনে বসে বেত-চেয়ারে, মধ্যিখানে বেতের টেবিল / মাথার উপর একলা বাতি / আর যারা সব অন্য ঘরে / তুমি আমায় বললে, ভালো—/ কথাটি শেষ করলে না আর, মুখটি নিচু / বলছি আমি, সত্যি ভালোই—কথাটি শেষ গাছ মুড়োলো / নটে গাছটি / সন্ধ্যেবেলায় ওইটুকুনিই শেষ উপহার / আর কিছু পাই, না পাই আমি বেঁচে থাকবো / আর কিছু পাই, না পাই আমি সুখে থাকবো···সুখে থাকবো।' (সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার)। এভাবেই তিনি একের পর এক চিত্রার্পিত কবিতা

রচনা করেছেন, যার ভাষা, আঙ্গিক একান্তই শক্তির। শব্দ ব্যবহারেও তিনি যথেষ্ট সচেতন। ভাসন্ত, নিভন্ত, ঘুটে খসা, পাংশু ঘাস, ভক্ত হনুমতী, সজিনা মায়া, উশিখুশি ভাব, পর্চে (পড়ছে)—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার বোধহয় তাঁকেই মানায়।

কাব্য গ্রন্থটির অপর বৈশিষ্ট্য, চিত্রী প্রকাশ কর্মকারের অনবদ্য পনেরোটি ড্রইং। অফব্ল্যাকে ছাপা প্রতিটি ড্রইংই কবিতার বিষয়প্রতিমার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ। একই রিদমে কবিতা ও ছবির বেজে যাওয়া। যে ভঙ্গিমায় শক্তি কবিতা-গুলিকে উপস্থাপন করেছেন, তা, এবং চিত্রী প্রকাশ যেভাবে কবিতানুসারী ছবির বিষয়প্রতিমাকে উপস্থাপন করেছেন, তা ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও একমুখী হওয়ায় বইটির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। কবির কলমের মোচড় আর শিল্পীর ব্রাশের প্রলেপে যুগলবন্দী যেন বা। এই বন্দীত্ব আরও প্রগাঢ় হয় বিপুল গুহ-কৃত প্রচ্ছদে। প্রকৃতির মাঝে নাবাল বালকের বিষণ্ণ মুখাবয়ব। মাটিরও হতে পারে। পাথরেরও হতে পারে। গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত 'নিরুদার জন্যে'! নিরোদ মজুমদারকেও স্মরণে বন্ধনে আবদ্ধ করা। বোধ হয় এতোসব কারণেই বইটি আশির দশকে আলোড়ন তুলেছিলো। যদিও শিল্পকৃত্য-সহ রচনা প্রকাশের পদ্ধতি, তখন আর তেমন অভিনব নয়। যিনি বুক-স্রষ্টা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ততোদিনে প্রকাশ করে ফেলেছেন প্রথমে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তারপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এমনতরো দুটি বই। এই ফাঁকে আরও একটি গূঢ় তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো ; সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার' প্রকাশের আগে শক্তি এবং প্রকাশ চেয়েছিলেন, এমনতরো এক উদ্যোগে সুনীলকেও শামিল করতে। প্রাথমিক পর্বের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবার পরও সুনীল কেন শামিল হননি, তা অজানাই থেকে গেছে।

বিষাদে-আসক্তিতে শক্তি

বাসব সরকার

"আগুনে পুড়ে গেল লোকটা ; কবি ও কাঙাল।" এই আগুন আর পুড়ে যাওয়ার অনুষঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবেদ। আধুনিক কোন কবি আগুনকে 'চিরপ্রণম্য' বলতে পারেন নি, যে ভাবে ও অর্থে শক্তির কবিতায় বলা হয়েছে। অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে আর্তি শক্তির কবিতায় ফিরে ফিরে শোনা গেছে তার জীবন প্রবাহের নানা বাঁকে, প্রায় প্রকৃতির মতোই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতায়। তাই প্রশ্ন জাগে জীবন-আসঙ্গ লিপ্সা যার জীবনের পরতে পরতে এতো বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে তারই মাঝে বারবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে তার এই আন্তরিক আকুতি কেন? নিশ্চয়ই এই একটি লাইন দিয়ে শক্তির বিপুল সৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করা যাবে না। কিন্তু তার মনের গড়নের কোন আভাসও কি তার মধ্যে নেই?

শক্তির ঘনিষ্ঠজনরা অনেকেই বলেছেন তার কবিতার একটা বড়ো দিক হলো আত্মজৈবনিকতা। সব কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক তাঁদের শিল্পকর্মের, সৃষ্টির মধ্য দিয়েই নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করেন। সেখানে পাওয়া যায় তাঁদের চিন্তা চেতনার নানা নিরিখ, নানা মোড় ফেরা। তারই মধ্যে কোন অনুষঙ্গ যদি ফিরে ফিরে আসে নানা বয়সের, নানা মেজাজের সৃষ্টির মধ্যে তাহলে বোধহয় ভাবনার সেই পৌনপুনিকতা একটু অন্যভাবেই দেখা দরকার হয় পড়তে পারে। শক্তি তার কবিতার মধ্যেই নিজেকে মেলে ধরেছে অকপটে, এবং অকৃপণভাবে। তাহলে এই মানুষটা কাঙাল ছিল কিসে?

শক্তি চলে যাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তার ঘনিষ্ঠজনরা যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের কথাতেই প্রথম দেখি, শক্তি কবি ছিল, কাঙালও ছিল সে খুব। ভালোবাসার কাঙাল। শক্তির ঘনিষ্ঠ আরো কেউ কেউ যা বলেছিলেন, তাতে মনে হয়েছে সে ছিল কবি ও মাতাল। তাই পড়ে শক্তির রাজার মতো চলে যাওয়ায় বিস্মিত অনেকে বলেছেন সে ছিল বুঝি মাইকেলের মতো। একজন স্রষ্টার কাঙালপনা যখন তার সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায় তখন বোঝা যায় তার সত্তার গভীরে এমন কোন একটা কিছুর অভিঘাত আছে যা তার অস্তিত্বের অঙ্গ। সেই অভিঘাত কাটিয়ে ওঠা কোন শক্তিধর মানুষের পক্ষেও সম্ভব নাও হতে পারে।

ভালোবাসার জন্যে এই কাঙালপনা মানুষ শক্তিকে অনন্যতা দিয়েছিল। অনেক ভালোবাসা সারা জীবন ধরে অনেকের কাছে পেয়েও তার ভালোবাসার কাঙালপনা কেন যায় নি ?

শক্তি নিজের জীবনটাকে গড়তে চেয়েছিল টান ভালোবাসা দিয়ে। আর কিছু নয়। তার ভালোবাসাও ছিল অশেষ। চেনাজানা, কম বা বেশি জানা সব মানুষের ভালোবাসায় একটা সহজ আন্তরিকতার সম্পর্ক সকলের সঙ্গে গড়ে তোলার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। তাই কবিতার জগৎ থেকে বহু যোজন দূরে যাদের জীবনচর্যা, তাদের জীবনের নিজস্ব গন্ডির মধ্যেও যে টান-ভালোবাসার একটা বিশেষ রূপ আছে, শক্তি সারা জীবন বারবার তাদের অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছে সেই ভালোবাসার উত্তাপ পেতে। এটা মানুষ ও কবি, দুই শক্তিরই প্রয়োজন ছিল। সেই ভালোবাসার জগতে জাত নেই, শ্রেণী নেই, বুদ্ধি নেই, বৃত্তি নেই, ছোট বড়ো, খ্যাত অখ্যাত, শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ নেই। শক্তি গড়তে চেয়েছিল এই সব ধরণের চেনা মানুষ নিয়ে, নতুন মানুষ চিনে নিয়ে তার ভালোবাসার একটা স্বতন্ত্র জগৎ, তার একান্ত নিজের এলাকা, যেখানে সে নিজেকে যেমন উজাড় করে দিতে পারে তেমনি অন্যদের কাছেও দাবি করতে পারে সব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে। শক্তি ভালোবাসার কাঙালপনায় অন্যদেরও কাঙাল করে ছেড়েছে। এই জগতের সব অনুশাসন তার নিজের গড়া। সেখানে সে স্বেচ্ছাচারী।

জীবনের রাজপথ থেকে শক্তি যে মাঝে মাঝেই ছুটে গেছে তার আনাচে কানাচে, গলিঘুঁজিতে; তার পেছনে অবশ্যই নানা কারণ ছিল। একটা কারণ ভালোবাসার কাঙালপনার জন্যে তার নানারূপ বৈচিত্র্যের অন্বেষা। আরেকটা ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে জীবনটাকে উল্টে পাল্টে দেখার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের কোন গূঢ় রহস্যের মুখোমুখি হওয়া। মনে হয় শক্তি জীবনকে দেখেছে অপার বিস্ময়ের চোখে। কিন্তু এই বিস্ময় তার চোখে কোন ঘোর লাগায় নি, তাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারেনি চিরকালের মতো। কারণ এই জীবন দেখার মধ্য দিয়েই এসেছে তার মৃত্যু চেতনা।

প্রথম যৌবনের অনিশ্চয়ের মুহূর্তগুলি বাদ দিলে অনায়াসে তার জীবনের বড়ো অংশটা ভরে তুলতে পারতো নিশ্চিন্তে, আরাম আয়েসে। কিন্তু সেটা বোধহয় হতো কবি হিসেবে তার নিঃস্ব, রিক্ততার দিকে। তার অস্তিত্বের অপমৃত্যু। জীবনকে সে দেখতে চেয়েছে তার সৌন্দর্যে, তার কুশ্রীতার মধ্যে,

উপচে পড়া প্রাচুর্য আর সীমাহীন বঞ্চনার মধ্যে। ভালোবাসার সর্বত্রগামিতা শক্তি যেমন নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে, একালের কোন কবির পক্ষে এদেশে বোধহয় তা সম্ভব হয় নি।

হয়তো শক্তির ঈশ্বর তাকে টেনে নিয়ে গেছেন জীবন স্বরূপ বোঝাতে জীবনের সবখানে। শক্তির ঈশ্বর ছিল তারই মতো ভালোবাসায় অকৃপণ, বিচিত্রগামিতায় বেপরোয়া। সে ছিল যেন সেই ঈশ্বরেরই একমাত্র প্রতিনিধি, কোথাও বা তার অভিন্ন স্বরূপ। সেই ঈশ্বর রাজপথ থেকে গলি ঘুঁজি, ভাটিখানা থেকে ছোট-নাগপুরের পাহাড়ে জঙ্গলে সর্বত্রই ছিল শক্তির সঙ্গে, শক্তির সঙ্গেই পদ্য লিখতো, মধ্যরাতে ফুটপাথ বদল করতো, টলমলো শক্তির অভ্রংলিহ শরীরের পৌরুষকে ঠিক পৌঁছে দিতো কোন এক ভালোবাসার ঠিকানায়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ও ঘুমে। তাই জীবন যাপনের জটিল ব্যূহ থেকে শক্তি যে মাঝে মাঝেই চলে যেতে পারতো মৃত্যুর কিনারায় আবার ফিরেও আসতো জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে নতুনতর কোন অভিজ্ঞতা বা অভিঘাতের জন্যে, সেটাও শক্তির সেই ঈশ্বরের খেলা। তাই তিনি দু বোতল মহুয়া শক্তির মুখ দিয়ে খেয়ে লিখতে পেরেছেন 'অবনীবাড়ি আছ'র মতো পদ্য। তিনি কবির ঈশ্বর, আমাদের আটপৌরে ঈশ্বর নয়, পোষাকী ঈশ্বর তো নয়ই।

কবির এই ঈশ্বর শক্তিকে নির্ভুলভাবে জানিয়েছে এই জীবন কাব্য নয়, কবিতা লেখা যায় না, কবিতা হয়ে ওঠে। জীবন স্বরূপের নগ্নতার মধ্যে শক্তি যা লিখতে পেরেছে তা কেবল পদ্য, কবিতা নয়। কিন্তু কখন যে সেই পদ্যগুলি তার গদ্যময় জীবনের নানা ভাঙ্গাচোরার মধ্য দিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে সে খবর তার পাঠকদের জানা আছে। শক্তি হয়তো নিজেই জানতে পারেনি তা, কিম্বা জানাতে চায়নি তার পাঠকদের। ভাবা যায় খাদের ধারে দাঁড়ালে যাকে চাঁদ ডাকে, গঙ্গার ধারে ঘুমন্ত দাঁড়ালে যাকে চিতাকাঠ ডাকে, খাদের অতলস্পর্শী গহ্বরের মতো যার মনে হয় অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ ভেসে আছে, চেতন ও অবচেতনে জীবন ও মৃত্যুর এই নিবিড় সহাবস্থান, আর তার পরেই সন্তানের মুখে চুমো খাওয়ার এক প্রবল আকাঙ্খায় শক্তি মৃত্যুর দিকে পিছন ফিরে সোজা হাঁটতে চায়। সেটা যে কখন তার পদ্যকে এক অনির্বচনীয় জীবন কাব্যে রূপান্তরিত করেছে, তাকে এক অমোঘ মাত্রা দিয়েছে সে যেন ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এমন এক চরম আবিষ্টতার মধ্যে সুতীব্র মৃত্যু চেতনা কিভাবে আসতে পারে তা কেবল শক্তির চেতনা থেকে না দেখলে বোঝা যায় না।

খণ্ড রুক্ষ জীবন স্বরূপের বেদনা ও গ্লানির মধ্যে পীড়িত কবিমন যখন প্রবল আর্তি জানায় 'ক্রিমেট মি ও ফায়ার' তখন সে আসলে মরতে চায় না, চায় আগুনে পুড়ে নিখাদ হতে। অপার্থিব ও পার্থিবের মধ্যে এই মেল বন্ধন ঘটানোর মধ্যে কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের কথা মনে পড়ে না, যে মাটি থেকে অনেক উপরে আকাশের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে ভেবেছিল তার শাবকদের কথা, নজর রেখেছিল তার ছোট নীড়ের দিকে।

জীবন থেকে বের হয়ে যাওয়া আর বারবার জীবনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসা, জীবনে হাত পেতে তার সব কিছু একান্ত করে পাওয়া, যাকে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সহাবস্থানও বলা যেতে পারে, যাকে কখনো মনে হয় জীবনের কলরোলের মধ্যে মৃত্যুর ডাক শোনা, এর সব কিছুর মধ্যে হয়তো কাজ করেছে শক্তির ব্যক্তিজীবনের কোন তীব্র বেদনাবোধ। চেতনার গভীরে থেকে সেই বোধ শক্তির পদ্যে এনেছে এক অন্তর্লীন বিষাদের সুর। সেই বিষাদ স্বাগতঃ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই বিষণ্নতা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

শৈশবে পিতৃহীন শক্তির পিতৃস্মৃতি তীব্র হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পিতার অভাব তার অবচেতন মনে এক গভীর শূন্যতাবোধ সৃষ্টি করেছিল, যার ছায়া পড়েছে তার জীবনে, তার পদ্যে। 'আমাকে একাকী ফেলে বাবা কেন দ্রুত চলে গেল', শক্তি কি সেই অশরীরী পিতৃত্বের অনুসন্ধান করে গেছে জীবনের পরতে পরতে, আর না পাওয়ার বেদনায় চলে যেতে চেয়েছে মৃত্যুর দিকে। তাই কি লিখতে পেরেছিল 'কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়, অমৃতই বিষ।' শক্তির মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ছাড়া কি এর তাৎপর্য শুধু কাব্যিক ব্যাখ্যায় সম্ভব? কে জানে?

অচেনা, কিন্তু চেনা-ও চিরতরে

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বন্ধু-বান্ধব সহপাঠী আত্মীয়স্বজনকে চিরকালের মতো পেছনে রেখে দিয়ে কে না এগিয়ে চলেছে এ সংসারে? তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে চলে আসতে বড় কষ্ট হয়। বড় নিষ্ঠুর মনে হয় নিজেকে। কিন্তু যখন ভাবি, সকলেই তো এইভাবে এগিয়ে চলেছে তখন কষ্টটা একটু হালকা লাগে। শক্তির মৃত্যুটাও এইভাবেই হালকা করে দিতে চাইছি। কিন্তু ঠিক যেন পারছি না। ওর সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকে এতোবার একসঙ্গে হেঁটেছি আর বসেছি, এবং অন্য-জায়গায় চাকরির সূত্রে এগোনর সময় ওর আকস্মিক আবির্ভাবে চমকে গেছি, এতো মান-অভিমানে দূরে থাকতে চেয়েছি যে কিছুতেই ওর উধাও হয়ে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারি না।

অনেকেই ছাত্রজীবনে দু'চারটে পদ্য-টদ্য লেখে, শক্তিও হয়তো লেখে, তবে বেশির ভাগই গদ্য—এই সময় একটা ধারণাই গড়ে উঠেছিল যখন ওর সহপাঠী হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের থার্ডইয়ারের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এসে ভরতি হই। হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম। কাজেই সারাটা দিনই কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা ওর সঙ্গে, কলেজের ক্লাসের আগে, মাঝে এবং পরে সন্ধে-বেলাও অনেকক্ষণ, কিংবা কফি হাউসে, যতক্ষণ না কফি হাউস বন্ধ হয়। ও উত্তর কলকাতায় থাকতো। দূর নয়, কাজেই বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া ছিল না। কিন্তু পরেকার শক্তিকে দেখে ঠিক চেনা যাবে না তখনকার শক্তিকে। এক গাল দাড়িতে ঢাকা মুখে পরবর্তী 'জিয়োগ্রাফি'টা তখনও স্পষ্ট হয় নি। পাজামা-পাঞ্জাবি পরতো। অম্লান বদনে সিগারেট খেতো। প্রেসিডেন্সি কলেজের একতলার বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে দেখতাম দোতলার সিঁড়ির শেষে আয়ত আকাশটা। ওই আকাশটাকে পেছনে রেখেই ও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদেরই অপেক্ষায়, একসঙ্গে বাইশ নম্বর ঘরে প্রথম ক্লাসে ঢুকবে বলে। ঠিক অইরকমভাবেই তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো, ন-নম্বর ঘরে অনার্স ক্লাসে একসঙ্গে ঢুকবে বলে। অনেক সময় ক্লাস করতো না, শুধুই আমাদের সকলের

কাছে মুখটা দেখাবে বলে দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপর ঘণ্টা পড়ার আগেই চলে যেতো। ক্লাসে পড়া-শোনার ব্যাপারে ওর খুব একটা মন যে ছিল তা নয়। তবে তখনকার কলেজ-জীবনে বাধ্য-বাধকতা অনেক ছিল, টিউটোরিয়াল নেওয়া লেখালেখি করানো এসব ব্যাপারে অধ্যাপকরা সতর্ক ছিলেন। কিন্তু যা পাঠ্য বই-টই পড়তে হতো তার সবই যে আমাদের ভালো লাগতো তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু শক্তির যে নিজস্ব একটা ভাবনা-চিন্তার জোর ছিল। ভুল হোক ঠিক হোক একটা সৎসাহস ছিল. তার প্রমাণ 'আরণ্যক' উপন্যাস সম্পর্কে ওর টিউটোরিয়ালের লেখা। আরণ্যক-এ গাছ-গাছড়া ফুল-লতাপাতার নামের বহর দেখে শক্তির মনে হয়েছিল শিল্পীর অতি-আসক্তি—লিখে ফেলেছিল,উপন্যাসটা 'গ্লোব নার্সারির ক্যাটালগ' হয়েছে। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী চটে গিয়ে বার করে দিয়েছিলেন ক্লাস থেকে। পরে এ প্রসঙ্গ উঠলেই ও কীরকম অদ্ভুত ভাবে হা-হা করে হাসতো। আমি ভাবলুম, ওর পছন্দ-অপছন্দ খুব স্পষ্ট ও জোরালো ছিল বলেই লিখে ফেলতে পেরেছিল। আমাদের পছন্দটা যতোটা জোরালো হয়ে ফুটতো, অপছন্দটা ততোটা জোরালো হয়ে উঠতো না।

নিয়মিত কলেজ-কফি হাউসের আড্ডা থেকে এই মুহূর্তে দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ও যে তখন কবিতা টবিতা লিখছে এমন কোন খবরই আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু একটা উপন্যাস যে লিখছে সে-কথা বলেছিল। বেশ কিছুদিন বাদে, একদিন বললে, লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। তারও কিছুদিন বাদে কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে কাউন্টারের কাছেই একটা টেবিলে বসে 'কুয়োতলা' নামের উপন্যাসটা প্রায় পুরোটাই শোনালো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। তখনও জানতাম না, ওর সঙ্গে গ্রামের জীবন জড়িয়ে আছে। কিন্তু উপন্যাসটা শুনে মনে হয়েছিল ও গ্রাম চেনে, গ্রামের ভাষা ওর মুঠোর মধ্যে। জীবন ও অভিজ্ঞতাকে ও নিজের মতো করে চিনে নিয়েছে, যা বলতে চায় তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, ওই বয়সের অনাস্বাদিত অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাকে ও ভাষায় ধরতে পারে, বয়সোচিত কাব্যগন্ধী ভাষায় লেখে না, আবেগকে কঠিন হাতে ধরতে পারে। গ্রামের মানুষ, গাছপালা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং বিশেষ করে নারী ওর নখদর্পণে। এমন এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ও জীবনটাকে ভোগ করতে চায় যেখানে আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলো যেন পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওরই কাছে ধরা দিতে চায়, ওরই ভোগ্য হতে চায়। পঞ্চাশের দশকে ওরই সমসাময়িক যাদের

উপন্যাস উল্লেখযোগ্য বলে একনিঃশ্বাসে আওড়াই তাদের চেয়ে 'কুয়োতলা' কোনো অংশে কম জোরালো নয়। কিন্তু হঠাৎই শক্তি-কে কবিতায় পেয়ে বসে বলে, উপন্যাসটা বেরিয়েছে অনেক পরে। অথচ পঞ্চাশ-ষাটের সন্ধির লেখা হিসেবে দেখলে তার মর্যাদা বাড়বে বই কমবে না। ওই উপন্যাস পড়ার মুগ্ধ স্মৃতিটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। এই রকমই গল্প-আড্ডায় কফি হাউসেই সন্ধে হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিটা বাড়লো। বেরোতে পারছি না। কফি হাউস বন্ধ হলো। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসে চক্রবর্তী চ্যাটার্জীর বন্ধ বইয়ের দোকানের সিঁড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। সামনের ফুটপাতে তখনও বইয়ের বেসাতি ছিল না. 'এই যে দাদা কী চাই' বলে হাত ধরে টানাটানি করতো না। দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। সঙ্গে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হওয়া সুনীল পাল ছিল। ও খুব গান ভালোবাসতো। পরে শক্তির চাইবাসার সঙ্গীও ছিল। শক্তিকে ও গান গাইতে বললো। শক্তি পরপর অনেকগুলো গান গাইলো। ওরকম ভরাট দরাজ গলায় নিখুঁত রবীন্দ্রসঙ্গীত আগে আমি শুনিনি কোনো সমবয়সীর কাছে। 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানটা এখনও শুনলে শক্তির গলাটাই আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জির বন্ধ দরোজার সামনের সিঁড়িটা, সামনে অন্ধকারে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বন্ধ পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো। দূরে ওয়াই এম সি এ-র গায়ে রাস্তার আলোটা, আর তার সঙ্গে জলে ভেজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আমরা কজন। ভোরের আকাশে সুরের বিস্তারের ছবিটা ভাসছে, ভিজে কলেজ স্ট্রীটের পর্দাটা সামনে থেকে সরে গেছে। তারপর শক্তি তো পরীক্ষা দিলে না। ইউনিভার্সিটিতে ও আসতো না। কিন্তু কফি হাউসে দেখা হতো। তখন 'কৃত্তিবাস' বেরিয়েছে এবং দেখছি শক্তি-র কবিতা ছাপা হচ্ছে। প্রথম দুয়েকটি কবিতা যেমন দাগ কাটে নি. অন্তত 'সুবর্ণরেখার জন্ম' কবিতাটি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত, কিন্তু তারপরেই আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে' ভুলতে পারি নি। পড়ে মনে হয়েছিল নিশ্চয় ও অনেক আগে থেকেই কবিতা লেখে, নইলে জীবন সম্পর্কে মান-অভিমান এতো তীব্রভাবে এমন অনাঘ্রাত ভাষায় ও ধরলো কী ক'রে? জিগ্যেস করলে বলতো, 'নারে কই তেমন কিছু তো লিখি নি।' আরো মনে হয়েছিল, ও উত্তর কলকাতায় যাবে ঠিকই, কিন্তু কলকাতায় ও প্রথম নিঃশ্বাস

নেয়নি, নিলে বাঙলার মাঠে-ঘাটে জলে-কাদায় আর নারীতে এমন মেশামেশি হয়ে থাকতো না ওর কবিতা।

একথা ঠিকই, আমাদের ছাত্রজীবনে বোদল্যোর-র‍্যাবো-র চর্চা শুরু হয়েছিল প্রধানত বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর পত্রিকা 'কবিতা'কে কেন্দ্র করেই। এবং যে-কিশোর-তরুণ কবির দল জীবনে অনেক কিছু পায়নি অথচ অনেক কিছুই কাম্য তাদের কাছে, বিশেষত স্বাধীনতার পরবর্তীকালের সেই নারকীয় পরিবেশের মধ্যে, তাদের কাছে এই দুই বিদেশী কবির দৃষ্টিভঙ্গি যেন জোরালো সমর্থন পেয়েছিল। শক্তি-সুনীল ও আরো অনেকেরই কবিতায় রক্ত-পুঁজ-কৃমি-কীটের ছড়াছড়ি তখন। যে গ্রাম ছিল শক্তির রক্তের মধ্যে সেই শান্ত উদাসীন এই শহরটাকে ভেদ করতে চেয়েছিল, তার সমস্ত শরীরটার মধ্যে যে ঈশ্বর ও শয়তানের পাশাপাশি বাস, তাকে টেনে বার করতে চেয়েছিল তার নিজেরই অন্তর্গত 'প্লাতেরো'-কে সঙ্গে নিয়ে, সহজ সারল্যের স্বপ্ন-প্রতীকটি নিয়ে। এমন একটা অবস্থায় যখন বীটনিকরা এলেন কোনো এক ঐতিহাসিক যোগাযোগের চক্রান্তে, তখন শক্তি মিশে গেল তাদের সঙ্গে। অসম্ভব জোরালো ভঙ্গিতে সে জীবনকে একের পর এক কবিতায় 'চেখে' নিয়ে চলেছে তখন। সচেতনভাবে শক্তি যদি বলে থাকে, সে আনন্দ কি অলোকরঞ্জনের কাছে অনেক কিছু শিখেছে, শিখেছে জীবনানন্দের কাছে, তবে সে প্রভাব বিপরীতের সঙ্গে বিপরীতের প্রভাব। সংস্কৃত ও ইংরিজির মাধ্যমে কতো কতো কবিকে যে সে আত্মসাৎ করেছে তার ঠিক নেই, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাবান অনুবাদক কখনোই নয় সে, সে-সবই রূপান্তর, তার নিজেরই শব্দ-জাদুতে সেখানে সব সময়েই সে উপস্থিত। এমনকি ছন্দ-স্পন্দেও। যাই হোক, গরল কি অমৃত যাই সে পান করুক, সে তখন প্রায় দুর্বার হয়ে পড়েছে আমাদের কাছে। তার নিজস্ব বা গোষ্ঠীগত জীবনপদ্ধতি সে খুঁজে পেয়েছে। নেশায়-পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

২

আমি তখন শান্তিনিকেতনে পড়াই। অ্যানড্রুজ পল্লীর কোয়ার্টার্সে থাকি। একদিন সন্ধেরাত্রিতে অন্ধকারে রিক্‌শার হর্ণ শুনে তাকিয়ে দেখি একটা রিকশা আমার কোয়ার্টার্সের সামনে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন পা তুলে দিয়েছে রিকশাওয়ালার ঘাড়ে। আর একজন হেঁটে আসছে—শক্তি! ঠিক 'প্রকৃতিস্থ

প্রকৃতি'র মতো নয় মনে হলো। ওকে দেখে নিজেকে ভিতু ভিতু গেরস্থ ভাবছি। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু বারান্দায় উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো, একেবারে ধাত ছাড়েনি দেখে ভালো লাগলো। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলো, ছেলেকে ধরে খুব আদর করলো। চা-টা খেলো। পুরোনো কলেজ-বন্ধুদের গল্প করলো। তারপর ওকে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখি, ওর সঙ্গী আমাদের বিশ্বভারতীর ছাত্র (পরে বহিষ্কৃত) বেহুঁশ হয়ে রিক্‌শায় কাত হয়ে রয়েছে। একটু হেসে শক্তি উঠে বললো, 'তোদের ছাত্র। বুঝলি।' ছাত্রটির তখন জ্ঞান ছিল না। 'কলকাতায় যাচ্ছিস তো, দ্যাখা হবে,' বলে শক্তি চলে গেল।

প্রায় এই সময়টাতে বা তার একটু আগে থেকেই শক্তি বেশ কিছু ভালো কবিতার পাশাপাশি এমন কিছু কবিতা লিখেছিল যাতে কিছু অভদ্র শব্দ বেমালুম চালিয়ে দিতে শুরু করে। ওর কাছে ব্যাপারটা নিছক মজা ছাড়া কিছু নয়। পরে কৃত্তিবাসে ওর এই জাতীয় কিছু কবিতাও বেরিয়েছে 'যৌনছড়া' নামে। আরো কিছু আছে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফসল' আর আমাদেরই এক ছাত্র মনোহর দাশের একটি পত্রিকায় (নামটা এখনই মনে পড়ছে না)। তবু শান্তিনিকেতনে থাকতে আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ কমে যায়। তবে ওর ওখানে কিছু ডেরা ছিল। সেখানে উঠলেই গিয়ে হাজির হতো। সামনাসামনি দেখা হলে ওর নিখাদ আন্তরিকতায় আমি তো সেই পুরোনো কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ফিরে যেতাম। কারো সম্পর্কে ওর কোনো বিদ্বেষ ছিল না। নানা পরিস্থিতিতে বন্ধু-বান্ধবের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা নিয়ে মজার মজার গল্প করতো। নিজেকে নিয়েও কৌতুক করতো।

৩

কলকাতায় যখন চলে এলাম তখন সাংসারিক ও আর্থিক কারণ আমার খুব দুশ্চিন্তা ছিল। শক্তি তখন আনন্দবাজারে আনন্দমেলার ভার নিয়েছে। আমি ওকে কথায় কথায় নিজের দুশ্চিন্তার কথা বললুম। ও বললে, তুই চলে আয় অফিসে, কিছু ভাবিস নি। গেলাম। গিয়ে দেখি, আনন্দমেলায় ডাকে আসা চিঠিগুলো পড়ছে এবং ছিঁড়ছে। আমাকে কালীচরণ ঘোষের বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে লেখা The Roll oi Honour (1965) বইটা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে, নাম করা শহীদ যাঁরা তাঁদের মৃত্যুবরণের মুহূর্তটাকে কীভাবে ছোটদের মতো সহজবোধ্য নাটকীয় ভাষায় একশো দেড়শো শব্দের মধ্যে লিখে দিতে হবে।

নামটাও ঠিক করে দিয়েছিল 'শহীদনামা'। এই নামেই আনন্দমেলায় বারো চৌদ্দটা লেখা বেরিয়েছিল। এবং আমার দুর্দিনে কিছুটা সাহায্য ও যে করেছিল সে কথা কোনোদিনই ভুলব না। বইটা ছাপানোর কথাও ও বলেছিল। কিন্তু আমি আবার বিশ্বভারতীতে প্রশাসনের কাজে (১৯৭৫-৮৬) চলে যাওয়ায় কথা এগোয় নি।

যখন বিশ্বভারতীতে প্রকাশনের কাজে ব্যস্ত তখন অফিসে একদিন শক্তির ফোন এলো—গম্ভীর গলায় বললে, কী রে ব্যস্ত নাকি। তখন শক্তি legendary figure। আমি কাজে অন্যমনস্ক ছিলুম বলে হঠাৎ শক্তির গলা শুনে ঘাবড়ে গেলুম। বললুম গেস্ট হাউসে থাকিস যদি তো বল। বলে দিচ্ছি। ভাবলুম, যদি অফিসে এলে বিপদে ফেলে। তার চেয়ে ঘর-টর ঠিক করে সামলে দিই। তারপর সন্ধে-বেলা ধরবো গিয়ে। কিন্তু আমি যে ঘাবড়ে গেছি সেটা যেন বুঝতে পেরেই টেলিফোনে বললে, 'ভয় নেই, সঙ্গে বউ আছে। তবে হ্যাঁ। একটা ঘর বুক করে রাখ। আমি চলে যাচ্ছি গেস্ট হাউসে।'

কিন্তু গেস্ট হাউসে ও যায় নি। দুশ্চিন্তা হলো। স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে বললো। অথচ কোথায় গেল। রাত ন-টা নাগাৎ বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ চাঁদের আলোয় সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়ে প্রায় বাঘের মতো গম্ভীর গলায় বললে, 'আমি আর গেস্ট হাউসে গেলুম না। cancel করে দে।' একজন চেনা কার যেন নাম করে বললে 'ওদের ওখানে উঠেছি। এখন খোয়াইতে যাচ্ছি।'

৪

বছর খানেক বাদে প্রকাশনের কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছি। হঠাৎ একদিন সকালে কাগজে দেখি, শক্তি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়াতে শক্তির প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলুম। লেখার আগে ওর কাছ থেকেই যে বইগুলো ছিল না সেগুলো নিয়ে আসি। তাতে একটা লাইনই ছিল যার মানে এই দাঁড়ায় যে কিছু কবিতায় সে এক সময় যৌনতা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল। সব মিলিয়ে ওর অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যকে বুঝিয়ে one of the most outstanding poets জাতীয় কিছু একটা বলেছিলুম।

শক্তির সঙ্গে মামলা। ভাবাই যায় না। রাগ দুঃখ অভিমান অনেক কিছুই হয়েছিল। সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব একদিন শক্তির কাছে যেতে বললো। আমি যেতে চাই নি। এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক প্রবীণ অধ্যাপক। তিনিও দিল্লী থেকে এসেছেন। তিনিও বললেন, আপনার যখন সহপাঠী বন্ধু তখন আকাডেমির হয়ে আপনি একটু বলুন, মামলাটা তুলে নিতে। অনেক ভেবে শক্তির বাড়ি গেলুম। ও বললে, তোর বিরুদ্ধে তো নয়। সাহিত্য অকাদেমি-র সম্পাদককে বলা হয়েছে এই লাইনটা কেটে দিতে। আমি বললুম, লেখাটা তো আমারই, আর ও লাইনটা কি একেবারেই মিথ্যে' তাছাড়া তোর সম্বন্ধে তো সবচেয়ে যা সত্যি এবং যা ভালো তা প্রাণ খুলেই বলেছি। ও কী রকম যেন মাথা নিচু করে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'এ রকম দু চারটে [খারাপ শব্দ] কী লিখেছি' তাতে কী ? তোকে ও-সব ভাবতে হবে না।' বললুম, 'বা আমি আসামী, আমাকে ভাবতে হবে না ?' শক্তি চুপ করে রইল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলুম।

বছর খানেক মামলা চলে। কোর্টে সাহিত্য অকাদেমির হয়ে আইনজীবী যেতেন। আমাতে যেতে হয় নি এই যা বাঁচোয়া। অনেকে ইণ্টারভিয়ু নিতে এসেছে। তার মধ্যে Illusrated Weeklyতে দেখলাম ভারত বিখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছে কলকাতার এক city teaher ! হায় ! আমি আবার অভিযোগ করলাম কোথায় ! যাই হোক সব ব্যাপারটা কী ভাবে কোর্ট অবধি গড়ালো তা শুনলাম সাহিত্য অকাদেমির অফিসে গিয়ে। সে ব্যাপারে নীরব থাকাই ভালো। যাদের মুখশ্রী চিনে গেছি তাদের মুখোশ থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি।

শক্তি যে নেচে উঠেছিল এইটেই আমার দুঃখ। এবং শেষ পর্যন্ত আমারই বিরুদ্ধে ! শক্তির মতো মানুষকে নাচানো সোজা এইটেই আমার সান্ত্বনা।

বেশ কিছুদিন দেখা নেই অরপর। একদিন শুনলাম শক্তি মামলাটা withdraw করে নিয়েছে। বলেছে 'ধুর'। ওরা আসেই না কোর্টে। মামলা টেনে কী হবে।

হঠাৎ একদিন মেট্রো-র সামনে দেখা। উল্টো দিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে আসছে দৌড়ে। ইদানীং ও রাস্তা হেঁটে পেরোতো না। সামনে একটা ট্যাক্সিতে

উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। আমি হতভম্ব! বললে, তুই মাইরি দেবতা!

—তাহলে যে লাইনটা লিখেছিলাম সেটা এই 'দেবতার ব্যাধি' বল্। আসলে তুই-ই দেবতা। এবং ওটাই তোর ব্যাধি!

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সামলাতে না পেরে বললুম, তোর সেই অসাধারণ লিরিকটা, সেই 'হৃদয়পুরে চলিতেছিল জটিলতার খেলা' নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার আনন্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলুম আমার বইতে—কতোদিন আগে! তখন কোন্ বন্ধু তোর কবিতা পড়ে এতো করে তার ভালো লাগাটাকে সাজিয়েছে তার ছাপা বইতে? বল্! আর তার বিরুদ্ধেই—তুই—ধরা গলায় শক্তি বললে—তুই তো আগে বলেছিলি।

ট্যাক্সিতে তোলবার জন্যে জোর জবরদস্তি করলে। আমি গেলুম না। অন্য কাজ ছিল।

আর দেখা হয়নি। শক্তি যেদিন মারা গেল তার পরের দিনই শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশান্যাল ইণ্টিগ্রেশন সেণ্টারে একটা সেমিনারে যাবার কথা ছিল। যাই নি। যেতে পারিনি। উনিশ নম্বর ঘরে ও মারা গেছে, আমি তো গিয়ে থাকি কুড়ি কিংবা আঠারোতে। না, অসম্ভব।

বাঙলা আকাদেমির সামনে শাদা চাঁদোয়ার নিচে অজস্র ফুলের মালার চাপে শক্তি চুপ করে শুয়ে আছে। শক্তির জড়ানো কণ্ঠে শক্তিই শুনছে তার কবিতা ঃ কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি···

অজস্র ফুলের মালার ধারে ধারে রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো উঁচু হয়ে আছে। রজনীগন্ধা।···

প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগেকার একটা অসম্ভব জমাট সন্ধের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা তখন কেউ চাকরি পেয়েছি, কেউ পাইনি। প্রিয়া সিনেমার উল্টোদিকে টি-ক্লাব নামে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। এখন 'সমবায়িকা' হয়েছে। ওখানেই আমাদের ছাত্রজীবনের আর তার পরেকার বেকার জীবনের আড্ডা ছিল। হঠাৎ শক্তি এসে হাজির ঃ বললে, চল পার্কে গিয়ে বসি। একটা লেখা শোনাবো। হাতে একটা বই। পেপার ব্যাক। ওপরে কিছু লেখা নেই।

পুরোনো বইয়ের দোকানে যেমন হলদে কভার দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে। দেশপ্রিয় পার্কে একটা লাইটপোস্টের তলায় আমরা বসলুম। শক্তি বইটা খুলে ওর স্বাভাবিক ভরাট গলায় পড়তে শুরু করলো। কানে আঙুল দেবার মতো সাধু পুরুষ আমরা কেউই নই। একটা ঘটনা পড়তে শুরু করতেই আমি হাসি চাপতে না পেরে ঘাসে শুয়ে পড়লুম। শক্তি এক ধমক দিলে, অমন খ্যান খ্যান করে হাসলে পড়া যায় না। এটা আমারই লেখা। এ জাতের সাহিত্যে আমি দুটো জিনিস নতুন আমদানি করেছি। এবং নায়িকার ঘরে তার বিছানায় ও টেবিলে রজনীগন্ধা রেখেছি সাজিয়ে। এ জাতের বইতে আগে রজনীগন্ধা-টন্ধা ছিল না। দুই নায়িকার গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়েছি।

ওরই লেখা! শুনে আমি খাড়া হয়ে বসলুম। আর হাসি নি। নিত্যপ্রিয় পাশে বসে নিঃশব্দে সারাক্ষণই হেসে গেল। আর উফ্ উফ্ করলে। 'হাই সোসাইটি' লেখার আগে শক্তি-ওয়েদার রিপোর্টের ভাষায় বলতে গেলে-'ওয়েল মার্কড লো' দিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল। হয়তো টাকা পয়সার অভাবেই। তবু এ সব কিছুর মধ্যেই আমি শক্তির আর্তনাদ সমর্পণ ধ্বংস কিংবা একটি দুর্দান্ত ছটফটানিই দেখতে পাই। দেখতে পাই চারিদিকে হেমন্তের পাতা ঝরলেও ও ডাকবিলি করে বেড়াচ্ছে দ্রুতগামী পোস্টম্যানের মতো। দেশপ্রিয় থেকে দেশবন্ধু পার্ক ও অনায়াসে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এখন তো দেখাচ্ছি, এক রাশ শাদা ফুল গায়ে চাপিয়ে কালো মুখ করে শুয়ে আছে। তা হলে?

'ডাকপিওনের পায়ের ধ্বনি একদিনও বাজবে না?'

ব্যক্তিপ্রসঙ্গ

জয়দেব বসু

১ ॥

ভূতগ্রস্তের মত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে আমি বাস করেছি দীর্ঘদিন। তাই, তন্নিষ্ঠ পাঠক হবার সুবাদে, এই ধৃষ্ট লেখার অবতারণা। গুণীজনে ক্ষমা করবেন।

২ ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-বিষয়ে কোন আলোচনা এ লেখার বিষয় নয়। কারণ—

(ক) 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' থেকে 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' পর্যন্ত নয়খানি কবিতা বই বিষয়ে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি কোনদিন এই বইকয়টিতে সংকলিত কবিতাগুলি থেকে মানসিকভাবে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারি একটুও, একমাত্র তবেই সে কাজে লিপ্ত হতে পারব। তার আগে নয়।

(খ) 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' পরবর্তী রচনাবলী বিষয়ে কোন মন্তব্য আমি করতে চাই না। করতে চাই না, কারণ, করার সময় এটা নয়। সাদর-কটাভাস, আর যারই হোক, আমার পক্ষে রুচিকর নয়।

৩ ॥

কবির প্রয়াণের পর থেকে এটা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, যাঁরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতি নিয়ে এযাবৎ হই-চই করেছেন ও করছেন, তাঁদের অধিকাংশই মন দিয়ে কখনো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েননি। এখনো পড়ছেন না। আজো তাঁরা মত্ত আছেন কবির জীবৎকালেই নানা গল্প-গাথায় গড়ে ওঠা তাঁর এক পুরাণপ্রতিম চেহারা নিয়েই। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে এটা ট্র্যাজেডি। আরো দুঃখের হল, এই ট্র্যাজেডির অন্যতম স্রষ্টা তিনি নিজেই।

৪ ॥

কত কথা শোনা যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে! তিনি উদ্ধত, অসহিষ্ণু, পানাসক্ত, উন্মার্গগামী···কত-কত কতশত কথা। হয়ত এমসমস্ত বিশেষণই অল্প বিস্তর সত্য। তবু, একটি সাক্ষ্য অন্তত আজ লিপিবদ্ধ করে রাখা যাক—গত

কয়েক বছর যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম, তিনি এসব কিছুই ছিলেন না।

হ্যাঁ, গান করতেন। গানও গাইতেন গলা খুলে। গানের সময়কার সেই বাউলভঙ্গিমা কি ভোলা যায়! তেমন আনন্দলগ্নে তাঁর চুম্বনাঘাত ললাটে সইতে দেখেছি নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনেককেই। যদিও, সে আশীর্বাদ, কেন জানি না, আমাকে কখনই শিরোধার্য করতে হয়নি। কপাল খোলেনি বলাই ভালো।

কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। বাদ বাকি যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমি দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। স্নেহশীল, পরিশীলিত এবং বিবেচনা-সম্পন্ন। বন্ধুবৎসল তো বটেই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা অমিতাভ দাশগুপ্তের নামোল্লেখেই চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। নিত্যপ্রিয় ঘোষের সহপাঠী হবার সুবাদে শঙ্খ ঘোষকে 'ছোড়দা' বলতেন। সেই ছোড়দা বা অশোক মিত্রর সামনে তাঁর বিনয়াবনত ব্যবহার তো রীতিমত শিক্ষনীয়। ঠাট্টাচ্ছলে তাঁরই কবিতা থেকে বাক্যাংশ ধার করে বলতে ইচ্ছে করত-'বিনয়াবনত পুষি'।

সমসাময়িক কবিতা ও কবিতা-লেখকদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নেও বিবেচনার ছাপ দেখেছি সর্বদা। একমত হয়েছি বেশির ভাগ সময়েই। শুধু একটি প্রসঙ্গ ছাড়া। তিনি মনে করতেন মেয়েদের দ্বারা কবিতা লেখা সম্ভব না। এই একটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। এছাড়া যাঁদের সম্পর্কে কখনো-কখনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাঁরা বিরূপ মন্তব্যের যোগ্য।

শুনেছি, নিজেকে বড় কবি বলে জাহির করতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। হয়ত করতেন। কিন্তু, আমার সামনে নয়। আমি কখনো তেমন কিছু দেখিনি। পরিবর্তে, শেষ জীবন পর্যন্ত দেখেছি নিজের লেখা সম্পর্কে গভীর অতৃপ্তি। আরো একবার জ্বলে উঠবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। একাধিকবার অনুজ এক অক্ষম শিক্ষানবীশকে বলেছেন, দেখবি, আবার এমন লেখা লিখব যে তোরা চমকে যাবি। অক্ষম সেই অনুজ তাঁর গায়ে হাত রেখে বলেছে, তাই লেখো শক্তিদা, তোমাকে এমন দেখতে আমার ভাল লাগে না। শুনে ঈষৎ আনমনা হয়ে গেছেন হয়ত বা। একটু পরে কিছুটা আত্মগত ভাবেই বলেছেন, সেই লেখাটা মনে আছে? সেই যে, 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা?' ঐ 'ফিরৎ' শব্দটার মধ্যেই কিন্তু আসল কবিতা। আবার 'চাহো' শব্দটা না লিখলে কিন্তু 'ফিরৎ'টা খুলত না। ধরতে পেরেছিস?

অনুজের চোখ তখন সিক্ত হয়ে এসেছে। ঝাপসা চোখে সে তখন দেখেছে

সামানে উপবিষ্ট এক রাজকীয় বৃদ্ধ ঈগল। কোনক্রমে সে মাথা নেড়েছে। তিনি তা লক্ষ করেছেন কিনা কে জানে। কিন্তু, বিড়-বিড় করে বলেছেন• আবার লিখব···আবার লিখব···।

এ দৃশ্য চোখে দেখা ও কথোপকথন কানে শোনা। পুনর্বার জ্বলে উঠতে তিনি পেরেছিলেন কিনা সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু এই গভীর অতৃপ্তি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শিক্ষার।

৫ ॥

অথচ, শেষ দিকে, ঐ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই রাজকীয় বৃদ্ধ ঈগলকে লাঞ্ছনাও কম সহ্য করতে হয়নি।

আর সব সইতে পারতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু, উপেক্ষা বা অবহেলা নয়। শেষ দিকে ঐ উপেক্ষা ও অবহেলাজনিত অপমানের ভারেই তিনি নুয়ে পড়েছিলেন প্রায়।

যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন তিনি, সেখান থেকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল, তা তাঁর মনে জন্ম দিয়েছিল এক তীব্র অভিমানের। অনুরাগীর পোষাক পরা নানা লোক তাঁকে ব্যবহার করেছিলেন নানা কাজে—অকাজে-কুকাজে। তিনি কি এসব বুঝতেন না? সবই বুঝতেন। কিন্তু, ভদ্রতার টান বড় টান। আমরা ইতিমধ্যেই জানি শঙ্খ ঘোষ কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভদ্রতাবোধ প্রবাদ-প্রতিম। তাঁরা কাউকে 'না' বলতে পারেন না। সেই সঙ্গে আজ একথাও জেনে রাখা দরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও অনেক ক্ষেত্রেই 'না' বলতে পারতেন না। এই তত প্রচারিত নয় খবরটা যাঁরা জানতেন, তাঁরা সুযোগ নিতে কসুর করেন নি।

আর, পরবর্তী প্রজন্মের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

অনুজ অনেক লেখক, কবিত্বশক্তিতে যারা তাঁর নখের যুগ্যি নয়, তাদের অনুদার অবহেলায় সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। মৃত্যুর পর অবশ্য তাদেরই কেউ-কেউ তাঁকে নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে জাল রচনার বেসাতি সাজিয়েছেন, নিজেদের বিশ্বভ্রমণ (নাকি বিশ্ববাণিজ্য?)-এর সাধ চাপাতে চেয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়ে।

শেষবার যখন হলদিয়া গেছিলেন কবিতা পড়তে, তখন দেখেছি, মঞ্চের পিছনে একটি সোফায় বসে ঝিমোচ্ছেন। একা। দুই হাত···না, হাত নয়, দীর্ঘ দুই ডানা দু পাশে ছড়িয়ে। আর, তাঁর থেকে চার-পাঁচ গজের মধ্যেই চলছে তথা—

কথিত তরুণ-তরুণীদের সোল্লাস কানাকানি ও পরচর্চা। তাঁর পরিচর্যা তো দূরস্থান, ন্যূনতম খবরাখবর নেওয়ার প্রয়োজনও কেউ বোধ করেনি।

এতটাই কি পাওনা ছিল তাঁর? এতটা অবহেলা! এতটাই অসম্ভ্রম! সজ্ঞানে কখনো কাউকে ঠকান নি। তবু, এতটাই!

দেখতে দেখতে গলায় যেন কাঁটা ফুটছিল সেদিন। মনে পড়ছিল—

'গগনবিহারী চিল! যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আঁস্তাকুড়ে কাপুরুষ মাস্তানের মত
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
হাতে কি কখনো আমি ঊর্ধ্বচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি?'

৬॥

তার চেয়ে এই ভাল। মাথা উঁচু করে যিনি বেঁচে ছিলেন, মাথা নিচু হবার আগেই তাঁর সরে যাওয়া ভাল।

যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াত হবার কথা ছিল, যথাসময়েই তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে। রাজকীয়ভাবেই। আর, যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন্ত থাকার কথা ছিল, তিনি এখনো বেঁচে আছেন সগৌরবে।

দা কিং ইজ ডেড্। লং লিভ দা কিং।

খণ্ড এপিটাফ

প্রদীপ দাসশর্মা

'এখন সে, ওরফে শক্তি, ওরফে অবনী, বাড়ি নেই। কারণ, 'স্থলের পদ্ম জলে / যখন যেতে বলে / তখন যেতেই হয়···'। শক্তিকে নিয়ে তবু খণ্ড এপিটাফ···। কবিকে তো মৃত্যু স্পর্শ করে না ; হাঃ, কবি মৃত্যু স্পর্শ করে অবলীলায়। সে, যন্ত্রণায়, দাহে, চারপাশ মুচড়ে দিতে পারে। জানে, 'ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতিপ্রথা আছে। এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে।' কবি তো নিজেও ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো, আউলিয়া, বাউল, উলুঝুলু···।

তাঁকে নিয়ে, বরাবরই, ব্লিজার্ড। সে নাকি নষ্ট, স্বেচ্ছাচারী! কবি নষ্ট না হলে নষ্ট হবে কে? শেয়ার-দালাল, রাজনীতিবিদ, আমলা, পুলিশ! 'নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে। 'আকাশ বাতাস সবই কষ্ট দেয় / অভ্যর্থনা নয়, স্বাগত জানায় দূরে শ্মশানের ধোঁয়া। ক্রমশ পোড়ার গন্ধ···।' আমরা কবির মত নষ্ট হইনি। তবু কষ্ট পাই। স্বমিতি-জীবনে (norm-bound) কষ্ট পাই। তুমি, কবি, তার চেয়েও গরিষ্ঠ কষ্টে···। কেননা, এখন, ''সময়ের গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন···'। শক্তি, বড় অসময়ে, তুমি চলে গেলে। নৌকোর মত গোটা মফস্বল তো কাৎ হয়ে ছিলো তোমার দিকে। পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্য ডিঙিয়ে, তোমার এই যাওয়া···। অথচ, লিখেছিলেঃ 'আমি তোমাদের দুয়ারে, এই চিরকালের জন্য বসে থাকলুম।' হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যান, আমাদের দিয়েছো লাভ-লেটার্স, লাভ লেটার্স, থ্যাঙ্ক য়্যু মঁসিয়ে চ্যাটার্জি···।

আজকাল ফুটপাত বদল হয় না মধ্যরাতে। দিনে-দুপুরেই, সব চালাকি নিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে পেশাদার মানুষ। হাসতে হাসতে কবির মৃত্যু দিবস পালন করে। মুহূর্তেই, ফের ভুলে যায় মৃত্যু তারিখ ও কবির ঠিকানা। কবির জন্য চিরকাল বসে থাকা হয়ে ওঠে না আমাদের। তবু আমাদের চিঠির অপেক্ষায় ছিলেন যিনি, সেই স্বেচ্ছাচারী, সেই কাঙাল কোথায়! আমাদের শোক নয়, অভিবাদন তাঁর প্রতি। অতএব, তোপধ্বনি হোক।

আসানসোলে ২৩ এপ্রিল ১৯৯৫ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
স্মরণ-সভায় পঠিত শোকলিপি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি

[প্রসঙ্গত বলা ভাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কবি, উপন্যাসিক, গল্পলেখক, ভ্রমণকাহিনী লেখক ফিচার-লেখক, অনুবাদক এবং সম্পাদক। তাঁর এ পর্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ। এই দুরূহ কর্মকে অনেকখানি সুসাধ্য করেছেন সমীর সেনগুপ্ত। তিনি 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' (১৯৯০) গ্রন্থের সম্পাদনাকালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি গ্রন্থপঞ্জি মুদ্রিত করেছিলেন। তিনি দাবি করেছেন. এই গ্রন্থপঞ্জি 'সম্পূর্ণ'। তাঁর এই দাবির যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি সম্পূর্ণ করতে আরও মনোযাগী হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থপঞ্জিও অসম্পূর্ণ। সমগ্র রচনার গ্রন্থ পরিচয় প্রকাশই গ্রন্থপঞ্জিকে সম্পূর্ণ করতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থপঞ্জিতে কেবল প্রকাশকাল ও প্রকাশনার উল্লেখ করা হয়েছে, 'গ্রন্থ পরিচয়' দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে 'গ্রন্থ পরিচয়' প্রদানের ইচ্ছা রইল। গ্রন্থপঞ্জিতে প্রথমে গ্রন্থের নাম, তারপরে প্রথম প্রকাশকাল ও প্রকাশনার উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে সর্বশেষে মুদ্রিত কবিতার সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।]

১, কাব্যগ্রন্থ

			কবিতার সংখ্যা
হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য	ফাল্গুন ১৩৬৭	গ্রন্থজগৎ	৭৬
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো	আশ্বিন ১৩৭২	বীক্ষণ	৮৫
অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে	আষাঢ় ১৩৭৩	গ্রন্থজগৎ -	১
সোনার মাছি খুন করেছি	আষাঢ় ১৩৭৪	ভারবি	২৭
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান	ফাল্গুন ১৩৭৫	অরুণা প্রকাশনী	৩২
পাড়েরকাঁথা মাটির বাড়ি	অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	বিশ্ববাণী	৪৯
চতুর্দশপদী কবিতাবলি	বৈশাখ ১৩৭৯	অরুণা প্রকাশনী	১০১
প্রভু নষ্ট হয়ে যাই	শ্রাবণ ১৩৭৯	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ.	৪৭
সুখে আছি .	বৈশাখ ১৩৮১	অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস	৩৯

ঈশ্বর থাকেন জলে	বৈশাখ ১৩৮২	বিশ্ববাণী	৭৩
অস্ত্রের গৌরবহীন একা	বৈশাখ ১৩৮২	একক প্রকাশনী	২৬
জ্বলন্ত রুমাল	বৈশাখ ১৩৮২	দে'জ পাবলিশিং	৪৯
ছিন্নবিচ্ছিন্ন	আশ্বিন ১৩৮২	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	১০৭
সুন্দর এখানে একা নয়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩	বিশ্ববাণী	৪৮
কবিতার তুলো ওড়ে	দোল পূর্ণিমা ১৩৮৩	দে'জ পাবলিশিং	৫৫
পাতাল থেকে ডাকছি	বৈশাখ ১৩৮৪	তাম্রলিপি	৪২
উড়ন্ত সিংহাসন	মাঘ ১৩৮৪	অরুণা প্রকাশনী	৫৬
মানুষ বড়ো কাঁদছে	আগস্ট ১৯৭৮	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৫৫
ভালবেসে ধুলোয় নেমেছি	অগ্রহায়ণ ১৩৮৫	করুণা প্রকাশনী	৫৬
পরশুরামের কুঠার	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	স্বরলিপি	৪২
ভাত নেই পাথর রয়েছে	আষাঢ় ১৩৮৬	দে'জ পাবলিশিং	৫৫
আমি চলে যেতে পারি	চৈত্র ১৩৮৬	সমকাল	৩৩
মন্ত্রের মতন আছি স্থির	বৈশাখ ১৩৮৭	বিশ্ববাণী	৫৪
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল	ডিসেম্বর ১৯৮১	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৫২
অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল	শ্রাবণ ১৩৮৭	দে'জ পাবলিশিং	৫২
আমি একা বড় একা	বৈশাখ ১৩৮৮	বিশ্ববাণী	৫৪
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ	মাঘ ১৩৮৮	নাভানা	৪০
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	মার্চ ১৯৮২	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৫৩
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে	বইমেলা ১৯৮৩	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৪২
কক্স বাজারে সন্ধ্যা	বইমেলা ১৯৮৪	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৬৩
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি	বইমেলা ১৯৮৫	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৪১

মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়	ভাদ্র ১৩৯২	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৭০
সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার	আগস্ট ১৯৮৬	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	১২
এই তো মর্মর মূর্তি	জানুয়ারি ১৯৮৭	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৪৫
বিষের মধ্যে সমস্ত শোক	২৫ বৈশাখ ১৩৯৪	মিরান্দা	৩৩
আমাকে জাগাও	বইমেলা ১৯৮৯	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৫৫
আমাকে দাও কোল		সমর তালুকদার	
পুণ্যি পুকুর পুষ্করিণী		মিঠু প্রকাশনী	
এই আমি যে পাথরে		বিশ্ববাণী	৪৯
ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে	জানুয়ারি ১৯৯১	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৪০
পাতাল টেনেছে আজ	জুলাই ১৯৯১	ক্যাম্প (কমিউনিকেশন এণ্ড মিডিয়া পিপল)	৪২
জঙ্গল বিষাদে আছে	১৯৯৪	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৪২

২. সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ

তিন তরঙ্গ (সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে)	অগ্রহায়ণ ১৩৭২	বাংলা কবিতা	
যুগলবন্দী (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে)	শ্রাবণ ১৩৭৯	বেঙ্গল পাবলিশার্স	২৩
ছোটদের বড়োদের (ছড়া) (দেবব্রত মল্লিকের সঙ্গে)	পৌষ ১৩৮০	মন্ডেল পাবলিশিং	
সুন্দর রহস্যময় (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে)	ভাদ্র ১৩৮৭	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ	৩

আমাদের অপ্রকাশিত (শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে)
সমর তালুকদার

৩. অনুবাদ

ওমর খৈয়ামের রুবাই	১ বৈশাখ ১৩৭৮	বিশ্ববাণী
মেঘদূত (কালিদাস)		বিশ্ববাণী
কুমারসম্ভব কাব্য (কালিদাস)	বৈশাখ ১৩৮৩	বিশ্ববাণী
পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা	জানুয়ারি ১৯৭৬	দে'জ পাবলিশিং
পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা	বৈশাখ ১৩৯৫	দে'জ পাবলিশিং
হাইনের প্রেমের কবিতা	আষাঢ় ১৩৮৬	দে'জ পাবলিশিং
রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা		দে'জ পাবলিশিং

৪. সম্মিলিত অনুবাদ

গালিবের কবিতা (আয়ান রসিদের সঙ্গে)	পৌষ ১৩৮১	বিশ্ববাণী
১০০ বছরের নিগ্রো কবিতা (মুকুল গুহর সঙ্গে)	১৯৮০	দে'জ পাবলিশিং
মাটির ঈশ্বরেরা কহিলিল যীব্রান (মুকুল গুহর সঙ্গে)	১৯৮০	আন্তরিক প্রকাশনী
দুইনো এলিজি (রিলকে)	বৈশাখ ১৩৮৯	দে'জ পাবলিশিং
মায়াকোভস্কির কবিতা (সিদ্ধেশ্বর সেন ও মুকুল গুহর সঙ্গে)	অগ্রহায়ণ ১৩৮৮	দে'জ পাবলিশিং
লোরকার কবিতা (অমিতাভ দাশগুপ্তের সঙ্গে)	আশ্বিন ১৩৮৯	দে'জ পাবলিশিং

৫. সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ

রিপোর্তাজ ও ছড়া

পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৯৬৯	অরুণা প্রকাশনী
সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৯৭১	বিশ্ববাণী
এই আলো হাওয়া রৌদ্রে (অসমিয়া কবিতা সংকলন) (বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে)	১৯৭৮	বিশ্বজ্ঞান

সেকালের ছড়া ১৯৮৭ অনন্য প্রকাশন
দুই বাংলার ছড়া ১৯৯৩ প্রতিক্ষণ
(এখলাসউদ্দিন আহমদ-এর সঙ্গে)

৬. কিশোর সাহিত্য

খৈরী আমার খৈরী মহালয়া ১৩৮৩ আশা প্রকাশনী
চলো তিতির সঙ্গে ১৯৮০ অনন্য প্রকাশন
হাতি ধরিয়ে নায়ার জানুয়ারি ১৯৮৬ দে'জ পাবলিশিং
বড়োদের ছড়া ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিসেস লিঃ

৭. উপন্যাস

কুয়োতলা ১৯৬১ সুজনী (চিত্ত সিংহ)
আমি চলে যাচ্ছি আগস্ট ১৯৭৬ শৈব্যা পুস্তকালয়
দাঁড়াবার জায়গা ১ বৈশাখ ১৩৯৩ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অবনী বাড়ি আছো আগস্ট ১৯৭৩ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
হৃদয়পুর রামায়ণী প্রকাশনী
কিন্নর কিন্নরী ১ বৈশাখ ১৩৮৪ বিশ্ববাণী
হাই সোসাইটি মণ্ডল বুক হাউস

৮. ছোটগল্প

বিবিকাহিনী ১৯৮৬ জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স

৯, ভ্রমণ সাহিত্য

উইকএন্ড বেঙ্গল পাবলিশার্স
চলো বেড়িয়ে আসি (১ম)
চলো বেড়িয়ে আসি (২য়)
জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্বিন ১৩৯২

১০ হিন্দী অনুবাদে

শংখ ঘোষ ঔর শক্তি চট্টোপাধ্যায় কী কবিতায়ে ১৯৮৭ রাজকমল পেপারব্যাক্স

১১. কাব্য সংগ্রহ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা চৈত্র ১৩৮০ বেঙ্গল পাবলিশার্স

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	চৈত্র ১৩৭৯	দে'জ পাবলিশিং
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ (১ম)	মাঘ ১৩৮২	বিশ্ববাণী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ (২য়)	বৈশাখ ১৩৮৫	বিশ্ববাণী
কুড়ি বছরে কুড়িটি (হাতের লেখায় ছাপা) বইমেলা	১৯৭৯	মায়া সেনগুপ্ত
পদ্য সমগ্র	জুলাই ১৯৮৯	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় বইমেলা (সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত)	জানুয়ারী ১৯৯৪	প্রতিক্ষণ
পদ্য সমগ্র ২	১ বৈখাশ ১৪০০	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এলেজি সংগ্রহ বইমেলা সংগ্রহ-(সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত)	১৯৯৩	কবয়ঃ
পদ্য সমগ্র ৩ (সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত)	জানুয়ারী ১৯৯৫	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রেমের কবিতা	বইমেলা ১৯৯২	বিকাশগ্রন্থ ভবন

১২· রম্যরচনা

রূপকথার কলকাতা (রূপচাঁদ পক্ষী ছদ্ম নামে)	শ্রাবণ ১৩৭২	নতুন প্রকাশক

১৩. ইংরাজি অনুবাদে

The Diffident Pcacock Translated by Lila Roy	৬ অক্টোম্বর ১৯৯১	বিশ্বজ্ঞান	২২
Realm of My Heart Translated by Chhanda Sen	৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ বইমেলা	বিশ্বজ্ঞান	৩৩
I Can but why should I go ? Translated by Jayanta Mahapatra	১৯৯৪	সাহিত্য একাডেমি	

সংকলক : জগন্নাথ ঘোষ

পরিচয়

বিষয় সূচি

শ্রাবণ ১৩৩৮-আষাঢ় ১৩৪৮

সংকলক

সরোজ হাজরা

দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ধরে 'পরিচয়' বাঙালার সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সম্ভবত বাংলা ভাষায় যে সব সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে 'পরিচয়' প্রাচীনতম। এই পত্রিকার পতিষ্ঠাতা-সদস্যেরা সকলেই ছিলেন বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এঁদের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর আড্ডায় এবং লেখক গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও কীর্তিমান প্রায় সকল লেখক ও বুদ্ধিজীবী। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক লেখকেরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে 'পরিচয়।' এক কথায় বলা যায়, প্রায় তিন প্রজন্মের লেখকের অবদানে 'পরিচয়' পুষ্ট হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের কথা, 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সেই বিপুল পরিমাণ লেখার বিষয় সূচির কোনো পঞ্জি আজ পর্যন্ত আমরা রচনা করতে পারি নি। 'পরিচয়' পত্রিকার অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে যে-বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় একটি আংশিক বিষয়সূচি সংকলিত করার চেষ্টা হয় মাত্র।

আমরা আনন্দিত যে, এতকাল পরে বিষয়সূচী সংকলনের সেই শ্রমসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ট সুহৃদ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সরোজ হাজরা।

অবিভক্ত বাঙলার ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে সরোজ হাজরা ছিলেন চল্লিশের দশকে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের অন্যতম। আজ সত্তরোর্ধ্ব বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি যেভাবে সংকলনের কাজে অগ্রসর হয়েছেন তার জন্য 'পরিচয়'-সম্পাদক মণ্ডলী তাঁর কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তাঁর সংকলিত প্রথম দশ বছরের 'পরিচয়'-এর প্রবন্ধ নিবন্ধ ও পুস্তক পরিচয়ের বিষয়সূচীর প্রথম কিস্তি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।' পরবর্তী সময়ে আমরা অন্যান্য বছরের কিস্তি প্রকাশ করতে সক্ষম হবো বলে আশা করি।

সম্পাদকমণ্ডলী, পরিচয়

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী

[শ্রাবণ, ১৩৩৮—আষাঢ়, ১৩৪৮]

সংকলক : সরোজ হাজরা

বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিষয়-সমৃদ্ধিতে পরিচয়ে প্রকাশিত রচনাবলী অনন্যতার দাবী রাখে। দর্শন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে এই রচনাগুলির নির্বাচিত বিষয়সূচী—ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক এবং পরিচয়ের আগ্রহী পাঠকের নানা প্রয়োজনে কাজে আসবে আশা করা অসংগত হবে না।

সাময়িক পত্রিকার জগতে পরিচয়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ বাংলা ১৩৩৮ সালে ত্রৈমাসিক পত্রিকা রূপে। ৬ষ্ঠ বর্ষ থেকে তা মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

বাংলার মনন ও চিন্তার জগতে পরিচয়ের আবির্ভাব ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পরিচয়ের "আড্ডায়" সেদিন সমবেত হয়েছিলেন সমসাময়িক বাংলার দিকপাল দার্শনিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ পরিচয়ের লেখাগুলিকে বর্গীকৃত রূপে আধুনিক প্রজন্মের কাছে উপস্থিত করা এই বিষয়সূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্থানাভাবের দরুণ নির্বাচিত রচনাগুলি বর্গীকৃত রূপে একত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেজন্য স্থির হয়েছে, এক এক দফায় দশ বছরের প্রকাশিত রচনাগুলি বর্গীকরণ করা হবে এবং প্রাপ্ত স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কিস্তিতে তা প্রকাশ করা হবে।

প্রথম দফায়, ১৩৩৮-১৩৪৮ এই দশ বছরের নির্বাচিত বিষয়সূচী প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিষয়সূচী রচনার ক্ষেত্রে মূলতঃ ডিউই এর দশমিক বর্গীকরণ এবং ডিউই অবলম্বনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর "বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণ" পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, এই সংকলন থেকে গল্প, উপন্যাস ও কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য, গল্প-উপন্যাস ও কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং সাহিত্যিক, কবি ও ঔপন্যাসিক—এঁদের উপর আলোচনা এই সংকলনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিচয়ের অন্যতম আকর্ষণ তার পুস্তক-পরিচয় বিভাগ। বিষয়গুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আলোচিত বিষয়ের পরিপূরকরূপে তাই 'পুস্তক পরিচয়' সম্পর্কিত রচনাগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়বিভাগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করলেও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে তার পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উপর সমস্ত রচনাকে একত্র রাখার প্রয়োজনে 'রবীন্দ্রচর্চা' একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে সংযোজিত হয়েছে।

বিষয়সূচীর প্রথম সারিতে লেখকের নাম, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। দ্বিতীয় সারিতে বিষয় এবং তার অধীন আখ্যা শিরোনাম এবং তৃতীয় সারিতে পরিচয়ের প্রকাশকাল। এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক ও জীবনীর ক্ষেত্রে। যেখানে মূল বিষয় বিভাগের বা উপবিভাগের অধীন বর্ণানুক্রমিক ভাবে আলোচিত ব্যক্তির নাম সাজানো হয়েছে এবং তাঁকেই একটা বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

বিষয়সূচীতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণগুলি ঃ—

অনু ঃ অনুবাদক অথবা অনুলেখক।

পুঃ মুঃ ঃ পুনঃমুদ্রণ।

পুঃ পঃ ঃ পুস্তক পরিচয়।

আঃ পুঃ ঃ আলোচিত পুস্তক।

সং ঃ সংকলক।

সঃ ঃ সম্পাদক।

সাময়িক পত্র

পরিচয়-ইতিহাস

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	পরিচয় (সম্পাদকীয়)	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	পত্রিকা	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।

॥ দর্শন ॥

। দর্শন-সাধারণ ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
আবু সয়ীদ আইয়ুর।	বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন	শ্রাবণ, ১৩৪১।
রাসবিহারী দাস।	হোয়াইট হেডের দর্শন।	মাঘ, ১৩৪০।

॥ ভারতীয় দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
আবু সয়ীদ আইয়ুব।	বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি।	কার্ত্তিক, ১৩৪১।
পুলকেশ দে সরকার।	ভারতীয় মূর্তবাদ।	ফাল্গুন, ১৩৪৬।
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	শব্দ ব্রহ্মবাদ।	চৈত্র, ১৩৪৫।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	অমৃতত্ত্ব সিদ্ধি।	আষাঢ়, ১৩৪৭।
ঐ	অমৃতত্ত্ব সিদ্ধির উপায়।	শ্রাবণ, ১৩৪৭।
ঐ	আবৃত্তি ও পুনর্জন্ম।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭।
ঐ	জীবমুক্তি।	ভাদ্র, ১৩৪৭।
ঐ	জীব মুক্তির পরে।	আশ্বিন, ১৩৪৬।
ঐ	জীবন মুক্তের দশা।	কার্ত্তিক, ১৩৪৭।
ঐ		অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।
ঐ	জীবের সাংপরায়।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	নিসর্গের অনুবর্ত্তন।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
ঐ	পরলোকে তর-তম।	পৌষ, ১৩৪৭।
ঐ	বিদেহ বৈকল্য।	ফাল্গুন, ১৩৪৭। চৈত্র, ১৩৫৭।
ঐ	মানবের নিয়তি।	বৈশাখ, ১৩৪২।
ঐ	মুক্ত বা 'অস্তংগত' মুক্তি।	বৈশাখ, ১৩৪০।
ঐ	ব্রাহ্মীস্থিতি।	
ঐ	মুক্তের অবস্থা।	মাঘ, ১৩৩৯।
ঐ	মোক্ষ ও নির্বাণ।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯।
ঐ	যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
ঐ	যাজ্ঞবল্কের জীববাদ।	মাঘ, ১৩৩৮, বৈশাখ, ১৩৩৯।
ঐ	যাজ্ঞবল্কের ব্রহ্মবাদ।	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ঐ	যাজ্ঞবল্কের মোক্ষবাদ।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
ঐ	স্বরাজ্য সিদ্ধি।	পৌষ, ১৩৪৭, মাঘ, ১৩৪৭।
হুমায়ুন কবির	পুস্তক পরিচয়। আ, পু, রাধাকৃষ্ণনের অ্যান আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অব লাইফ ও রিলিজিয়ন ইন্ দি ইণ্ট এ্যাণ্ড ওয়েণ্ট।	মাঘ, ১৩৪০।

॥ ন্যায় দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	ন্যায়মতে আত্মবাদ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, আষাঢ়, ১৩৪৬।

॥ সাংখ্য দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ঐ	সৎকার্য্যবাদ (সমর্থন)	কার্ত্তিক ১৩৪৪।
ঐ	সৎকার্য্যবাদ (খণ্ডন)	মাঘ, ১৩৪৪।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	সাংখ্যের সাংপরায়।	মাঘ, চৈত্র ১৩৪৪, বৈশাখ ১৩৪৫।

॥ মীমাংসা দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	মীমাসামতে আত্মবাদ।	শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৪৬।

॥ বৌদ্ধ দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ঐ।	ক্ষণিকবাদ।	অগ্রহায়ণ, মাঘ, ১৩৪৬।
ঐ	বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা সিদ্ধি।	আশ্বিন, ১৩৪৫।
ঐ	বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ।	শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৪৫।
ঐ	বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।	অগ্রহায়ণ ১৩৪৫।
ঐ	স্থির মতির ত্রিংশিকাভাষ্য।	পৌষ, ফাল্গুন ১৩৪৫।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	মোক্ষ ও নির্বাণ।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

॥ জৈন দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
বটকৃষ্ণ ঘোষ	জৈন ও বাৎসপুত্রীয় মতে আত্মবাদ।	কার্ত্তিক, ১৩৪৬।

॥ ইউরোপীয় দর্শন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের দৃষ্টি ঃ বেটি হেইন ম্যান রচিত ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন ফিলসফি পুস্তকের উপর আলোচনা।	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।
হুমায়ুন কবির	ইমানুয়েল কাণ্ট।	বৈশাখ, ১৩৪২।
ঐ	কাণ্ট ও বিজ্ঞানবাদ।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।

॥ ধর্ম ॥

॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

সুশীলকুমার মৈত্র।	ধর্ম, যাদুবিদ্যা ও আর-আর ম্যারেই।	বৈশাখ, ১৩৪৩।

॥ হিন্দু ধর্ম ॥

॥ বেদ ॥

বটকৃষ্ণ ঘোষ।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ অক্ষয় কুমারী দেবী প্রণীত দ্য এভোলিউশন অব দ্য রিগভেদিক প্যানথিওন।	চৈত্র, ১৩৪৪।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ঃ রামপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বেদান্ত প্রবেশ।	শ্রাবণ, ১৩৪৪।

॥ উপনিষদ্ ॥

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	উপনিষদে জীবতত্ত্ব।	কার্ত্তিক, ১৩৪৬।
ঐ	পঞ্চাগ্নি বিদ্যা।	ফাল্গুন, ১৩৪৬।
ঐ	পিতৃযান ও দেবযান—উপনিষদের উপদেশ।	মাঘ, ১৩৪৬।
ঐ	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ শ্রীশচন্দ্র সেন প্রণীত দ্য মিস্টিক ফিলসফি অব দ্য উপনিষদস্।	ফাল্গুন, ১৩৪৬।

॥ বৈষ্ণব ধর্ম ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
আশানন্দ নাথ	বৈষ্ণব ধর্ম ও স্বদেশ সেবা।	চৈত্র, ১৩৪৪।
চারুচন্দ্র দত্ত।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বিপিন চন্দ্র পাল প্রণীত বেঙ্গল ভৈষ্ণবিজম ।	শ্রাবণ, ১৩৪১।
প্রিয়রঞ্জন সেন	পুস্তক পরিচয়। আ, পু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত— প্রেম ধর্ম ।	ভাদ্র, ১৩৪৬।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	অভিসার ও সংঘ।	ফাল্গুন, ১৩৪৩।
ঐ	পরকীয়া তত্ত্ব।	ভাদ্র, ১৩৪৪। আশ্বিন, ১৩৪৪।
ঐ	প্রেমের প্রগতি।	মাঘ, ১৩৪৪।
ঐ	ভক্তি ও প্রেম।	কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
ঐ	মধুরা রতি।	মাঘ, ১৩৪৪।
ঐ	মহা মিলন।	আষাঢ়, ১৩৪৪। শ্রাবণ, ১৩৪৪।
ঐ	মাথুর।	বৈশাখ, ১৩৪৪।
ঐ	মাথুরের পর মিলন।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।
ঐ	মান ও মানান্ত।	চৈত্র, ১৩৪৩।
ঐ	রতির তারতম্য।	পৌষ, ১৩৪৪।
ঐ	রাসলীলা।	মাঘ, ১৩৪২। বৈশাখ, ১৩৪৩।
ঐ	রাসলীলা, ইতিহাস না রূপক।	শ্রাবণ, ১৩৪৩। ভাদ্র, ১৩৪৩। আশ্বিন, ১৩৪৩। কার্ত্তিক, ১৩৪৩। অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩। পৌষ, ১৩৪৩।

॥ বৌদ্ধ ধর্ম ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	বৌদ্ধধর্মের দান।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
ঐ	বৌদ্ধধর্মের দান : বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র।	মাঘ, ১৩৩৮।
ঐ	বৌদ্ধধর্মের দান : হীনযান-বৈভাষিক ও সৌভান্ত্রিক।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
ঐ	বৌদ্ধধর্মের দান।	শ্রাবণ, ১৩৪১।
ঐ	মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা।	আষাঢ়, ১৩৪৭।
প্রমথ চৌধুরী।	পুস্তকপরিচয়। আঃ পুঃ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য-প্রবোধচন্দ্র বাগচী	আষাঢ়, ১৩৪৬।
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	হিন্দু ও বৌদ্ধ।	বৈশাখ, ১৩৪৩।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা।	মাঘ, ১৩৪০। বৈশাখ, ১৩৪১। শ্রাবণ, ১৩৪১। কার্তিক, ১৩৪১। মাঘ, ১৩৪১।

॥ খৃষ্ট ধর্ম ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
আশানন্দ নাগ।	সুদূর প্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম।	আষাঢ়, ১৩৪৬।
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	সুদূর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম।	ভাদ্র, ১৩৪৬।

॥ সমাজতত্ত্ব ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক পরিচয় : আঃ পুঃ সোরেকিন, পিতৃম-স্যোশাল অ্যান্ড কালচারাল ডিনামিক্স।	কার্তিক, ১৩৪৫।

॥ সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
জ্যোৎস্না কান্ত বসু	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ বেনডিক্ট, রুথঃ প্যাটার্নস অব কালচার।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
সমর সেন	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ কড্ওয়েল ক্রিস্টোফার ঃ স্টাডিস ইন, ডাইং কাল্চার।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
সুশোভন সরকার	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ সুইস, সিসিল ডেঃ মাইন্ড ইন্ চেইনস্।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।

॥ সংখ্যাতত্ত্ব ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
হরিশ চন্দ্র সিংহ	বিদেশে অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্রের গবেষণা পদ্ধতি।	শ্রাবণ, ১৩৪১।

॥ রাষ্ট্রনীতি ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রবীর চন্দ্র বসু মল্লিক	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ হ্যালডেন, জে বি এস ঃ হেরিডিটি এ্যান্ড পলিটিকস্	আষাঢ়, ১৩৪৫।
সমর সেন	পুস্তকপরিচয় আঃ পুঃ স্পেণ্ডার, স্টিফেন ঃ ফরোয়ার্ড ফ্রম লিবারেলিজম্!	ভাদ্র, ১৩৪৪।
সুশোভন সরকার	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ ম্যানহিম্, কার্ল ঃ ইডিয়লজি এ্যাণ্ড ইউটোপিয়া।	শ্রাবণ, ১৩৪৪।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
সুশোভন সরকার	পুস্তক-পরিচয়। আ পুঃ রাসেল, রাটল্যান্ড : পাওয়ার এ্যান্ড নিউ স্যোসাল এ্যানালিসিস।	চৈত্র, ১৩৪৫।
	॥ গণতন্ত্র ॥	
নীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ রবার্টসন: চার্লস গ্র্যান্ট : দ্য ফিউচার অব পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসি।	ভাদ্র, ১৩৪৫।
হিরণ কুমার সান্যাল	সমৃদ্ধি, সঙ্কট ও সংকল্প।	মাঘ, ১৩৪১।
	॥ একনায়কত্ববাদ ॥	
লীলাময় রায়	ডিক্‌টেটরশিপ্‌।	মাঘ, ১৩৪২।
	॥ ফ্যাসিবাদ ॥	
অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ সুগোলিনী : ফ্যাসিজিম ডক্‌ট্রিন এ্যান্ড ইন্‌স্টিটিউশন। ডাট্‌, আর. পিঃ ফ্যাসিজিম এ্যান্ড দি সোসাল রেভোলিউশন।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
প্রবীর চন্দ্র বসু মল্লিক	ফ্যাশিজম্‌ ও সমর।	ভাদ্র, ১৩৪৫।
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ এম, এন. রায়. ফ্যাসিজিম।	মাঘ, ১৩৪৫।
সুশোভন সরকার	ফ্যাশিসম।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পুস্তক-পরিচয়।	

	আঃ পুঃ উইনটিংহাম, টি-এইচ : দ্য কামিং অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার। সানডে মিনি, গ্যায়ে-টানো : আন্ডার দি এজ অব ফ্যাসিজিম।	মাঘ, ১৩৪৩।

॥ মার্কসবাদ ॥

প্রথম চৌধুরী	মার্কসের ডায়ালেক্‌টিক।	শ্রাবণ, ১৩৪৩।
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ হুক্‌, সিডনে : ফ্রম হেগেল টু মার্কস। জ্যাকসন, টি এ : ডায়েলেক্‌টিকস্‌।	পৌষ, ১৩৪৩।
ঐ	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ অসবর্ণ, আর : ফ্রয়েড এ্যান্ড মার্কস। ভূমিকা : জন্‌ স্ট্র্যাচি।	ভাদ্র, ১৩৪৪।
সুশোভন সরকার	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ মুরে, জন্‌ মিডল,টন : দ্য নেসেসিটি অব কম্যুনিজম্‌ টুডে। লেনিন, ভি, আই : দ্য টিচিং অব কার্ল মার্কস।	মাঘ, ১৩৩৯।
ঐ	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ হেকার, জুলিয়াস এফ : মস্কো ডায়েসগম এবং আরো দুটি বই।	মাঘ, ১৩৪১।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
সুশোভন সরকার	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ মার্কস প্রবেশিকা—রেবতী বর্মন। মার্কসীয় দর্শন—রবি রায়। বিপ্লবী চীন—সুধাংশু দাসগুপ্ত।	শ্রাবণ, ১৩৪৬।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ এঙ্গেলস্ ফ্রেডারিক ঃ অ্যান্টি ড্যুরিং।	শ্রাবণ, ১৩৪২।
ঐ	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বার্নস্, এমিল (সঃ); অ্যা হ্যান্ডবুক অব মার্কসিজম্।	বৈশাখ, ১৩৪৩।

॥ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
সুশোভন সরকার।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বার্কেনাউ, একঃ দ্য কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

॥ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ—দেশে বিদেশে ॥

। রাশিয়া।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ওয়েব্, সিড্নে ও বিয়েট্রিস ঃ সোভিয়েট কম্যুনিজম্ অ্যা নিউ সিভিলাইজেসন।	আশ্বিন, ১৩৪৩।
সুশোভন সরকার।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ জিদ্ আঁদ্রে ঃ রিতুর দে পি ইউ আর এস এস। স্ট্র্যাচি, জন ঃ থিওরি এ্যান্ড প্র্যাকটিশ অব স্যোশিয়ালিজম্।	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪।

লেখক	আদ্য শিরোনাম	প্রকাশকাল
ঐ	সোশ্যালিজমের মূল সূত্র।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
ঐ	সাম্যবাদের সংকট।	চৈত্র, ১৩৪৪।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ হিল এলিজাবেথ ঃ (অনুঃ ও সঃ) দ্য লেটারস্ অব লেনিন।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।
	। ভূমি অর্থনীতি।	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।		
	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ শচীন সেন ঃ স্টাডিজ ইন দি ল্যাণ্ড ইকনমিকস অব বেঙ্গল। রাধাকমল মুখার্জী–ল্যাণ্ড প্রব্লেমস্ অব ইণ্ডিয়া।	শ্রাবণ, ১৩৪৩।
	॥ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি আন্দোলন ॥	
সঞ্জয় ভট্টাচার্য।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ম্যান, টমাস ঃ দিস ওয়ার।	ভাদ্র, ১৩৪৭।
সুশোভন সরকার।	আন্তর্জাতিক সঙ্কট।	শ্রাবণ, ১৩৪২।
	॥ শিক্ষা ॥	
অনাথনাথ বসু।	শিক্ষা ও সমাজ ঃ বার্টাণ্ড রাসেলের 'এডুকেশন এ্যাণ্ড দি স্যোসাল অর্ডার গ্রন্থের উপর আলোচনা'।	মাঘ, ১৩৪০।
	॥ ভাষা শিক্ষা ॥	
অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।	বাংলা ও ইংরাজী।	আষাঢ়, ১৩৪৫।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
নীরেন্দ্রনাথ রায়।	বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত।	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।
	॥ সামাজিক রীতিনীতি ॥	
	। সামাজিক আচার ব্যবহার ।	
	। বিবাহ ও পরিবার ।	
পদ্মা বসু।	বিবাহ ও নীতি।	বৈশাখ, ১৩৩৯।
বিজয়চন্দ্র মজুমদার।	বিবাহ-বিধি।	মাঘ, ১৩৩৯।
বিমান বিহারী মজুমদার।	গোষ্ঠী-বিবাহ।	কার্ত্তিক, ১৩৪১।
	। মেলা ও উৎসব ।	
কালীপদ মিত্র।	প্রাচীন ভারতে উৎসব ও ব্যসন।	বৈশাখ, ১৩৪২।
	॥ নৃতত্ত্ব ॥	
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।	মানুষের মন, মগজ ও আত্মা।	কার্ত্তিক, ১৩৪৫।
	। ভারতীয় নৃতত্ত্ব।	
অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।	আদি-আর্য্য পিতৃভূমি।	শ্রাবণ, ১৩৪১।
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।	ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস।	আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ মাঘ, ফাল্গুন চৈত্র, ১৩৪৭। বৈশাখ, আষাঢ় ১৩৪৮।
	॥ ভারতের বিভিন্ন সমাজ ও সামাজিক সমস্যা ॥	
	। ভারতের হিন্দু সমাজ ।	
আশানন্দ নাগ।	অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ।	চৈত্র, ১৩৪৫।
	। ভারতের মুসলমান সমাজ ।	
আবদুল ওদুদ।	পথ ও পাথেয় ঃ মুসলিম জাগরণ ও মহম্মদ ইকবাল।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
	। হিন্দু মুসলমান সমস্যা ।	
আশানন্দ নাগ।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বি. কে. মল্লিক ঃ দ্য ইণ্ডিভিজুয়াল এ্যান্ড দ্য গ্রুপ।	বৈশাখ, ১৩৪৬।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬
	। আফ্রিকার জাতি সমস্যা।	
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।	আফ্রিকায় শ্বেত কৃষ্ণ।	মাঘ, ১৩৪২
	॥ ভাষাতত্ত্ব ॥	
পুলকেশ দে সরকার।	ভাষা ও আচরণ তত্ত্ব।	আশ্বিন, ১৩৪৭
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী।	অধ্যাপক আতোয়ান মেইয়ে ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব।	পৌষ, ১৩৪৩
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	ভাব ও ভাষা।	শ্রাবণ, ১৩৪২
ঐ	শব্দ ও বাক্য।	শ্রাবণ, ১৩৪৩
সরসীলাল সরকার।	মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
	। ব্যাকরণ শাস্ত্র বৈয়াকরণ।	
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি।	কার্ত্তিক, ১৩৪৩
	। বাংলা ছন্দ।	
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।	গদ্যের ছন্দ।	মাঘ, ১৩৩৯।
ঐ	নয় মাত্রার ছন্দ।	কার্ত্তিক, ১৩৪০।
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।	শেষ সপ্তকের ছন্দ।	মাঘ, ১৩৪৩
নবেন্দু বসু।	ছন্দ।	ফাল্গুন. ১৩৪৭
প্রবোধ চন্দ্র সেন।	বাংলা ছন্দের শ্রেণী বিভাগ।	বৈশাখ, ১৩৩৯।
প্রিয়রঞ্জন সেন।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ দিলীপ কুমার রায়—ছান্দসিকী।	শ্রাবণ, ১৩৪৭।
বিনয় ঘোষ।	ভাষা ও ছন্দ।	বৈশাখ, ১৩৪৪
	। বাংলা বানান।	
মঞ্জু ঘোষ।	বাংলা শব্দের নূতন বানান।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪
	। চীনা ভাষা।	
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী।	চীন দেশের ভাষা।	শ্রাবণ, ১৩৪৪।
	। বিজ্ঞান।	

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য।	সমষ্টি বিজ্ঞান ও ড. বসুর সমষ্টি গণিত।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু।	বিজ্ঞানের সংকট।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ স্ফোর্ড অ্যাণ্টার ঃ সাইন্স মার্চে'স অন।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ।	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৪৬।

॥ শিল্পকলা ॥

। নন্দন তত্ত্ব ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ	সৌন্দর্যতত্ত্ব।	পৌষ, ১৩৪৩।
আবু সয়ীদ আইয়ুব	সুন্দর ও বাস্তব।	মাঘ, ১৩৪১।
ঐ	সৌন্দর্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী?	বৈশাখ, ১৩৪৩।
আশানন্দ নাগ	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ফলিং উড, আঃ জিঃ—প্রিন্সিপলস্ অব আর্ট।	আষাঢ়, ১৩৪৬।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ আলেকজাণ্ডার এসঃ বিউটি এ্যান্ড আদার ফর্মস্ অব ভ্যালু।	কার্ত্তিক, ১৩৪১।
ঐ	শিল্প ও স্বাধীনতা।	শ্রাবণ, ১৩৪৪।

। ভাস্কর্য ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।	ভারতের ভাস্কর্য।	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।

। মুদ্রাতত্ত্ব ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত।	প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় শিব মূর্ত্তি।	মাঘ, ১৩৪২।

॥ চিত্রকলা ॥

। বিদেশী চিত্রকলা ।

লেখক	অ্যাখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অপরূপ মুখোপাধ্যায় ।	ডাচ্ ছবি ।	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩৪৪ ।
ঐ	স্পেইনের ছবি	চৈত্র, ১৩৪৩ ।

॥ সঙ্গীত ॥

। সঙ্গীততত্ত্ব ।

লেখক	অ্যাখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অমিয়নাথ সান্যাল ।	গানের সমালোচনা ।	পৌষ-মাঘ, ১৩৪৪ ।
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।	পুস্তক পরিচয় । আঃ পুঃ রবীন্দ্রলাল রায়— রাগ নির্ণয় । সাহানা দেবী ও দিলীপকুমার রায়— নবগীতি মঞ্জরী ।	বৈশাখ, ১৩৪২ ।
রবীন্দ্রলাল রায় ।	পুস্তত পরিচয় । আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সুর ও সঙ্গীত" ।	কার্ত্তিক, ১৩৪২ ।
হারীতকৃষ্ণ দেব ।	পুস্তক পরিচয় । আঃ পুঃ দিলীপকুমার রায়— সাঙ্গীতকী ।	কার্ত্তিক, ১৩৪৫ ।
হেমেন্দ্রলাল রায় ।	সমালোচনার আলোচনা ঃ অমিয় নাথ সান্যালের 'গানের সমালোচনা' প্রবন্ধের সমালোচনা ।	ফাল্গুন, ১৩৪৪ ।

। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ।

লেখক	অ্যাখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ।	"সঙ্গীত তরঙ্গ" ও গানের প্রাচীনধারা ।	চৈত্র, ১৩৪৪ ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
হেমেন্দ্রলাল রায়।	বাংলা ও হিন্দী গান।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।
ঐ	হিন্দুস্তানী ও বাংলা গান।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
ঐ	হিন্দুস্তানী সঙ্গীত ও বর্তমান জগৎ।	মাঘ, ১৩৩৯।
	॥ বিনোদন ॥	
	। বাংলা নাটক ও নাট্যকার ।	
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।	দীনবন্ধুর নাটক।	ফাল্গুন, ১৩৪৩।
শাহেদ সুরহবর্দি।	আধুনিক নাট্য প্রসঙ্গ।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
	। বাংলা নাট্যমঞ্চ—ইতিহাস ।	
হিরণকুমার সান্যাল।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।
	॥ সাহিত্য ॥	
	। সাহিত্যতত্ত্ব ।	
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ ফক্স, রালফ্ ঃ দ্য নভেল এ্যান্ড দি পিপল্।	পৌষ, ১৩৪৪
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	অথ কাব্য জিজ্ঞাসা ঃ ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনীর সাহিত্য শাখার অভিভাষণ।	বৈশাখ, ১৩৪১।
নলিনীকান্ত গুপ্ত	কাব্যের মহত্ত্ব।	আষাঢ়, ১৩৪৫।
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	ভবিষ্যতের শিল্প ও সাহিত্য।	মাঘ, ১৩৪৩।
ফসটর, ই, এন্	ইংলন্ডে স্বাধীনতা (প্যারিস জুন ১৯৩৫-এর আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ) অনু ঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব।	চৈত্র, ১৩৪৩।

লেখক	অ্যাখা শিরোনাম	প্রকাশকাল
বীরেন দাস।	গণ সাহিত্য, শ্রেণী সাহিত্য ও নিম্ন শ্রেণীর সাহিত্য।	মাঘ, ১৩৪৭
রণেন মজুমদার।	আর্টের সৃষ্টি না আর্ট-সৃষ্টি।	আশ্বিন, ১৩৪৪।
ঐ	স্ল্যাভ রিয়ালিজম্।	আষাঢ়, ১৩৪৭
লীলাময় রায়।	সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯
শশিভূষণ দাসগুপ্ত।	ট্র্যাজিডি ও তাহার বিবর্তন।	বৈশাখ, ১৩৪৫
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	মনুষ্য ধর্ম।	বৈশাখ, ১৩৩৯
সুশীলকুমার দেব।	সাহিত্য ও সমাজ।	ভাদ্র, ১৩৪৩।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	সংস্কৃতি সঙ্কট।	বৈশাখ, ১৩৪৩
হুমায়ুন কবির।	সাহিত্যে বাস্তবতা।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯
	॥ সংস্কৃত সাহিত্য-আলোচনা ॥	
ফণীভূষণ রায়।	বুদ্ধচরিতম্ ও কালিদাসের কাব্য।	কার্ত্তিক, ১৩৪১।
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট।	মাঘ, ১৩৪২।
	। সংস্কৃত উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ।	
	। বানভট্ট ।	
প্রথম চৌধুরী।	পুস্তক-পরিচয় আঃ পুঃ বাংলা কাদম্বরী— প্রবোধেন্দু নাথ ঠাকুর।	মাঘ, ১৩৪৪।
	॥ বাংলা সাহিত্য-আলোচনা ॥	
প্রিয়রঞ্জন সেন।	বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
শ্যামাপদ চক্রবর্তী।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ প্রিয়রঞ্জন সেন ঃ ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গলি লিটারেচার।	মাঘ, ১৩৩৯।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
সরসীলাল সরকার।	বাংলা সাহিত্যে মনঃ সমীক্ষণ।	আশ্বিন, ১৩৪৬।
	॥ বাংলা কাব্য ॥	
	। কাব্য তত্ত্ব।	
অতুলচন্দ্র গুপ্ত।	রীতি বিচার।	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।
ঐ	রীতি বিচার প্রসঙ্গ	কার্ত্তিক, ১৩৩৯।
ঐ	পুস্তক পরিচয়।	চৈত্র, ১৩৪৭।
	আঃ পুঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ঃ কাব্যবিচার।	
নবেন্দু বসু।	কবিতার প্রকার।	আষাঢ়, ১৩৪৮।
ঐ	ভাব, রস ও রূপ।	মাঘ, ১৩৪৭।
নলিনীকান্ত গুপ্ত।	কবি ও যোগী।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	কাব্যের মুক্তি।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
	। বাংলা কাব্য—আলোচনা ।	
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।	বাংলা কাব্য সংকলন	বৈশাখ, ১৩৪৩।
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কবিতা।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।
	॥ বাংলা কাব্য ও কবি ॥	
	। জয়দেব ।	
শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।	জয়দেব ও গীতগোবিন্দ।	আশ্বিন, ১৩৪৪।
	প্রেমেন্দ্র মিত্র ।	
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ। প্রেমেন্দ্র মিত্রঃ সম্রাট।	কার্ত্তিক, ১৩৪৭।
	। বুদ্ধদেব বসু ।	

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অজিত দত্ত	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ নতুন পাতা।	ফাল্গুন, ১৩৪৭।
	। যতীন্দ্রনাথ সেন।	
শ্যামাপদ চক্রবর্তী	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ যতীন্দ্রনাথ সেন ঃ কাব্য পরিমিতি।	শ্রাবণ, ১৩৩৯
	। সমর সেন।	
বিষ্ণু দে।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ সমর সেনের কয়েকটি কবিতা।	ভাদ্র, ১৩৪৪।
	॥ বিদেশী কাব্য ও কবি ॥	
	। ইয়েটস্, ডব্লু বি।	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ডব্লু বি য়েটস ও কলা-বৈকল্য।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩।
ঐ	সম্পাদকীয় ঃ য়েটস্ সম্পর্কে।	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
	। এলিয়ট, টি এস।	শ্রাবণ, ১৩৪১।
ঐ	ঐতিহ্য ও টি, এস, এলিয়ট।	
	। জাপানী কাব্য।	
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	জাপানী কবিতা।	ভাদ্র, ১৩৪৫।
	॥ বাংলা গল্প-উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ॥	
	। জগদীশ গুপ্ত।	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ জগদীশ গুপ্ত —লঘুগুরু।	কার্ত্তিক, ১৩৩৮।
	। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।	ফাল্গুন, ১৩৪৭।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
মনীন্দ্র রায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়—বেদেনী।	
	। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	
বিষ্ণু দে।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আবর্ত্ত।	কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
	। প্রমথ চৌধুরী।	
অতুলচন্দ্র গুপ্ত।	অনুকথা সপ্তক প্রমথ চৌধুরী	শ্রাবণ, ১৩৪৬।
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	প্রমথ চৌধুরীর গল্প।	বৈশাখ, ১৩৪৮।
পূর্ণেন্দু গুহ।	গল্প-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী।	মাঘ, ১৩৪৫।
	। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।	শ্রাবণ, ১৩৪৩।
সন্তোষকুমার প্রতিহার।	রোহিনী।	মাঘ, ১৩৪৫।
সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।	আশ্বিন, ১৩৪৩।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র।	আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৪৫।
ঐ	দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বেন্থামের হিতবাদ।	কার্ত্তিক, ১৩৪৫।
ঐ	দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব।	অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪৫।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
	। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	
দিলীপকুমার রায়।	পথের পাঁচালী।	মাঘ, ১৩৩৮।
নীরেন্দ্রনাথ রায়	পুস্তক-পরিচয় ঃ অপরাজিত।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
	। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।	

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।	কার্ত্তিক, ১৩৪৭।
	।শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	
অচ্যুতানন্দ গোস্বামী।	শরৎচন্দ্র ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।
সুধাময় ভট্টাচার্য্য।	শরৎ সাহিত্যের গোড়ার কথা।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
	॥ বিদেশী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ॥	
	। টলস্টয়, লিও।	
লীলাময় রায়।	"সমর ও শান্তি" ঃ টলষ্টয়ের 'ওয়ার এ্যান্ড পীসের' উপর আলোচনা।	বৈশাখ, ১৩৪১।
	॥ ইতিহাস ॥	
	। ইতিহাস চর্চা।	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	ইতিহাস।	বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ১৩৪০।
ঐ	ইতিহাসের কাল।	ভাদ্র, ১৩৪৪।
ঐ	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"	কার্ত্তিক, ১৩৪২।
সুশোভন সরকার।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পু টয়েনবি, আরা'ড জেঃ এ্যা স্টাডি এ অব হিস্ট্রি।	মাঘ, ১৩৪২।
	। ইউরোপ—ইতিহাস।	
ঐ	পুস্তক পরিচয়।	শ্রাবণ, ১৩৪৩।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
	আঃ পুঃ ফিশার, এইচ, এ এল ঃ এ্যা হিস্ট্রি অব ইউরোপ।	
ঐ	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ লাস্কি হ্যারল্ড জেঃ দ্য রাইজ অব ইউরোপীয়ন লিবারেলিজম।	কার্ত্তিক, ১৩৪৩।
ঐ	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ আয়ার, এডোয়ার্ডস ঃ ইউরোপীয়ন সিভিলিজেশন, ইটস্ ওরিজিন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট।	বৈশাখ, ১৩৪৪।

॥ ইউরোপ-ইতিহাস-আধুনিক যুগ ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
নীরদকুমার ভট্টাচার্য।	ইউরোপ ও অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।
ঐ	ইউরোপে সমর সঙ্কট।	আষাঢ়, ১৩৪৪।
নীরদকুমার ভট্টাচার্য।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ জোনস্ ঃ হিটলারস ড্রাইভ টু দি ইস্ট।	মাঘ, ১৩৪৪।
মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত।	১৯৩৪–১৯৩৭।	ফাল্গুন, ১৩৪৩।
সুধাময় ভট্টাচার্য্য।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ উইসক্ম্যান এলিজাবেথ ঃ চেকস্ এ্যান্ড জার্মানস্।	পৌষ, ১৩৪৫।
সুশোভন সরকার।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ রাসেল, বার্টান্ড ঃ ফ্রিডম এ্যান্ড অর্গানিসেশন। ও	বৈশাখ, ১৩৪২।

আরো দুইটি বই।

। গ্রেট ব্রিটেন-ইতিহাস।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	আধুনিক ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
সুশোভন সরকার।	পুস্তক-পরিচয়।	ফাল্গুন, ১৩৪৫।
	আঃ পুঃ লাস্কি, হ্যারলড জেঃ পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট ইন ইংল্যাণ্ড অ্যা কমেণ্টারি।	
	। জার্মানি-ইতিহাস।	
সুশোভন সরকার।	জার্মানির দুরবস্থা।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
ঐ	পুস্তক পরিচয়।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩।
	আঃ পুঃ রোসেনবার্গ, আর্থার ঃ অ্যা হিষ্ট্রি অব দ্য জার্মান রিপাবলিক। ক্লার্ক, আর টিঃ দ্য ফল অব জার্মান রিপাব্লিক।	
	। ফ্রান্স-ইতিহাস- আধুনিক যুগ।	
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	পুস্তক পরিচয়।	পৌষ, ১৩৪৩।
	আঃ পুঃ থোরেজ, মরিস ঃ ফ্রান্স টু ডে এ্যাণ্ড দ্য পিপলস্ ফ্রন্ট।	
	। স্পেইন-ইতিহাস।	
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।	পুস্তক-পরিচয়।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
	আঃ পুঃ মোরে, আঁদ্রে ঃ ডেম অব হোপ।	

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
শুশোভন সরকার।	স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি।	কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
ঐ	স্পেনে অন্তর্বিরোধ।	আশ্বিন, ১৩৪৩।
সৌরেন্দ্রনাথ বসু।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ জেলিনেক, ফ্র্যাঙ্ক ঃ দ্য সিভিল ওয়ার ইন স্পেন।	ভাদ্র, ১৩৪৫।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ পিটকারন্, ফ্রাঙ্ক ঃ রিপোর্টার ইন্ স্পেন ও আরো তিনটি বই। । রাশিয়া-ইতিহাস।	চৈত্র, ১৩৪৩।
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ ট্রটস্কি, লিওন ঃ দ্য হিস্ট্রি অব দ্য রুশিয়ান রেভোলিউশন।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক।	পুস্তক পরিচয়। আঃপুঃ শার্জি, ভিক্টর ঃ ফ্রম লেনিন টু স্ট্যালিন।	বৈশাখ, ১৩৪৫।
বিমানবিহারী মজুমদার।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ কোহন্, হ্যানস ঃ ন্যাশন্যালিজম ইন দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন।	কার্ত্তিক, ১৩৪০।
ঐ	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ	মাঘ, ১৩৪০।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
	ফ্লোরিন্স্কি এম টিঃ ওয়ার্ল্ড রেভোলিউশন এ্যাণ্ড দ্য ইউ এস এস আর।	
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ হিন্ডাস মরিশঃ দ্য গ্রেট অফেনসিভ্।	কার্ত্তিক, ১৩৪০।
সুশোভন সরকার।	রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত।	কার্ত্তিক, মাঘ, ১৩৩৮।
ঐ	রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা।	শ্রাবণ, ১৩৩৮।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ এম, এন. রায়। দ্য রুশিয়ান রেভোলিউশন।	আষাঢ়, ১৩৪৫।
	। গ্রীস-ইতিহাস।	
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।	গ্রীক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা।	পৌষ, মাঘ ১৩৪৬।
	মধ্য এশিয়া ইতিহাস।	পৌষ, ১৩৪৬।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ কালেটন, প্যাট্রিক ঃ রেরিড এম্পায়ারস।	
	। প্যালেস্টাইন-ইতিহাস।	
ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।	প্যালেস্টাইনের সমস্যা।	শ্রাবণ, ১৩৪৪।
	। চীন-ইতিহাস।	
নীরদকুমার ভট্টাচার্য্য।	চীনজাপান সমস্যা।	ভাদ্র, ১৩৪৪।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	চীনের প্রতিরোধ।	মাঘ, ১৩৪৪।
	। মাঞ্চুরিয়া-ইতিহাস।	
সুশোভন সরকার।	মাঞ্চুকুয়ো।	বৈশাখ, ১৩৪০।
	। ভারতবর্ষ-ইতিহাস।	

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
গ্রুসে, রেনে।	রেনে গ্রুসের ভারতবর্ষ, ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪৬। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭।
প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ হাচিনসন, লেস্টার: এম্পায়র অব দ্য নবাবস্।	পৌষ, ১৩৪৪।
প্রমথ চৌধুরী।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ভারত ও মধ্য এশিয়া।	বৈশাখ, ১৩৪৪।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস।	চৈত্র, ১৩৪৭।

। ভারতবর্ষ—ইতিহাস—প্রাচীনযুগ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অমূল্যচন্দ্র সেন	সম্রাট অশোকের শিলালিপি।	চৈত্র, ১৩৪৬। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩৪৭। পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪৭।
হারীতকৃষ্ণ দেব।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ ম্যাকে, আর্নেস্ট: দ্য ইন্ডাস সিভিলিজেশন। । ভারতবর্ষ—ইতিহাস আধুনিক যুগ।	শ্রাবণ, ১৩৪২।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ল্যামন্ট, গাব্রিয়েল ও অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ সিফ, লিওনার্ড এম ঃ দ্য প্রেজেন্ট কন্‌ডিশন অব ইণ্ডিয়া।	আষাঢ়, ১৩৪৬।
হিরণকুমার সান্যাল	দেশ-বিদেশ ঃ ফেডারেশন।	ভাদ্র, ১৩৪৬।
	। ভারতের জাতীয় আন্দোলন।	
বসুধা চক্রবর্তী	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ এম. এন. রায় ঃ আওয়ার ডিফারেন্সেস।	শ্রাবণ, ১৩৪৬।
বিমানবিহারী মজুমদার।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ মুক্তির সংধানে ভারত।	মাঘ, ১৩৪৭।
সুধাংশু দাশগুপ্ত।	সুন ইয়াৎ সেন ও মহাত্মা গান্ধী।	চৈত্র, ১৩৪৫।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম	শ্রাবণ, ১৩৪৫।
	। বাংলা-ইতিহাস-প্রাচীন যুগ।	
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা।	আষাঢ়, ১৩৪৫।
	। বাংলা-ইতিহাস-আধুনিক যুগ।	
চারুচন্দ্র দত্ত।	। পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ হিষ্টি অব পলিটিক্যাল থট	মাঘ, ১৩৪১।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
	—রামমোহন টু দয়ানন্দ-বিমানবিহারি মজুমদার।	
নরেন্দ্রনাথ নাগ।	পাঠকগোষ্ঠি ঃ শচীন সেন লিখিত বাঙ্গালীর রাজনীতি প্রবন্ধের সমালোচনা।	মাঘ, ১৩৪৭।
শচীন সেন।	বাঙ্গালীর রাজনীতি।	অগ্রহায়ণ ১৩৪৭।
	। বাংলার কৃষক আন্দোলন।	
নিখিলনাথ চক্রবর্তী	ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ও কৃষকের দাবী।	শ্রাবণ, ১৩৪৭।
শচীন সেন	ফ্লাউড কমিশন ও জমিদারী প্রথা।	আষাঢ়, ১৩৪৭।
	॥ জীবনী ॥	
	। দার্শনিক।	
	। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।	
সরোজকুমার দাস।	আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রসঙ্গে।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
	॥ মানবতাবাদী ॥	
	। মোর, টমাস।	
সুশোভন সরকার	টমাস মোর ঃ পুঃ পঃ। আঃ পুঃ আর. ডব্লিউ চেম্বার্স এর টমাস মোর।	ভাদ্র, ১৩৪৩।
	॥ বাঙালী মনিষী ও সমাজ সংস্কারক ॥	
	রামমোহন রায়।	
বিমানবিহারী মজুমদার	রাজা রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক শিষ্যদল।	কার্ত্তিক, ১৩৪০।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ঐ	রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
	॥ জাতীয় নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ॥	
	জওহরলাল নেহেরু।	
হিরণকুমার সান্যাল।	পুস্তক পরিচয়ঃ জওহরলাল নেহেরুর আত্মচরিত।	আশ্বিন, ১৩৪৫।
	। মহাত্মা গান্ধী।	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	মহাত্মা গান্ধী।	চৈত্র, ১৩৪৬।
	॥ ভাষাতত্ত্ববিদ ॥	
	। গ্রিয়ার্সন, জর্জ।	
প্রবোধচন্দ্র বাগচী।	স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন।	বৈশাখ, ১৩৪৮।
	। হুকার নাগেল, য়াকব	
বটকৃষ্ণ ঘোষ।	য়াকব্ হবাকার নাগোল।	মাঘ, ১৩৪৫)
	॥ বৈজ্ঞানিক ॥	
	। আইনষ্টাইন, অ্যালবার্ট।	
সত্যেন্দ্রনাথ বসু।	আইনষ্টাইন।	শ্রাবণ, ১৩৪২।
	পাভলোভ, ইভান, পেত্রোভিচ।	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	সম্পাদকীয়। (পোভলোভ সম্পর্কে)	বৈশাখ, ১৩৪৩।
	। প্রফুল্লচন্দ্র রায়।	
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মেঘনাথ সাহা এবং অন্যান্য সম্পাদিত 'আচার্য রে কমেমরেশন ভল্যুম'।	কার্ত্তিক, ১৩৪০।

॥ সাহিত্যসেবী ॥

। রোঁলা, রোমাঁ ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।	পুস্তক-পরিচয় । আঃ পুঃ রোঁলা, রোমা ঃ আই উইল নট রেস্ট।	চৈত্র, ১৩৪৪ ।

॥ ভারততত্ত্ববিদ—জীবনী ॥

। বুর্ণুফ, ইউজেন ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ।	ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুর্ণুফ ।	ফাল্গুন, ১৩৪৫ ।
	। বেরগেদ, আবেল ।	
ঐ	আবেল, বেরগেদ ও বেদানুশীলন ।	আষাঢ়, ১৩৪৪ ।
	। লেভি, সিলভ্যাঁ ।	বৈশাখ, ১৩৪৩ ।
ঐ	সিলভ্যাঁ লেভি ।	
	। য়াকোবি, হের্মান ।	
বটকৃষ্ণ ঘোষ ।	হের্মান্ য়াকোবি ।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪
	। পুরাতত্ত্ববিদ ।	
	। পেলিও, পল ।	
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ।	অধ্যাপক পল পেলি ।	ভাদ্র, ১৩৪৩ ।

॥ রবীন্দ্রচর্চা ॥

। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-আলোচনা ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয় । আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পসল্প, আরোগ্য ও জন্মদিনে ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	বিশু।	বৈশাখ, ১৩৩৯।
ঐ	রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য।	
পাউন্ড এজরা।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।
বসুধা চক্রবর্তী।	মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ।	
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	রবীন্দ্রনাথ ও সম্পত্তির স্বরূপ।	বৈশাখ, ১৩৪০।
যোগানন্দ দাস।	রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববোধ।	মাঘ, ১৩৪৩।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খঃ।	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬।
ঐ	রবীন্দ্ররচনাবলীর ২য় ও ৩য় খঃ সম্পর্কে আলোচনা।	
হিরণকুমার সান্যাল।	সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

॥ রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর।	শ্রাবণ, ১৩৪৫।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	কালান্তর।	শ্রাবণ, ১৩৪০।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রিয়রঞ্জন সেন।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা পরিচয়।	বৈশাখ, ১৩৪৬।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ছন্দ ॥

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
প্রিয়রঞ্জন সেন।	পুস্তক-পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা পরিচয়।	বৈশাখ, ১৩৪৬।
	॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ছন্দ ॥	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	ছন্দ বিতর্ক।	শ্রাবণ, ১৩৩৯।
ঐ	ছন্দের হসন্ত হলন্ত।	মাঘ, ১৩৩৮।
ঐ	নবছন্দ।	কার্ত্তিক, ১৩৩৯।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।	ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ।	মাঘ, ১৩৩৯।
	॥ রবীন্দ্রচিত্রকলা ॥	
জ্যোতির্ময় রায়।	রবীন্দ্রনাথের ছবি।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।
বিশু মুখোপাধ্যায়।	রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭।
	॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত ॥	
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।	রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে দু চারটি কথা।	শ্রাবণ, ১৩৪২।
হেমেন্দ্রলাল রায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরবিতান। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বরলিপি, সম্পাদনা-শৈলজানন্দ মজুমদার।	ভাদ্র, ১৩৪৫।
হেমেন্দ্রলাল রায়।	রবীন্দ্রনাথ ও গান।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।
	॥ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা ॥	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	সাহিত্যের মাত্রা।	শ্রাবণ, ১৩৪০।
	॥ রবীন্দ্রকাব্য ও কাব্যতত্ত্ব ॥	
প্রভাসচন্দ্র ঘোষ।	রবীন্দ্রকাব্যে তত্ত্ব বিচার।	মাঘ, ১৩৪০।
বিভূপ্রসাদ বসু।	রবীন্দ্রকাব্যে বর্ণ বৈচিত্র্য।	ভাদ্র, ১৩৪৪।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	আধুনিক কাব্য।	বৈশাখ. ১৩৩৯।

লেখক	আখ্যা শিরোনাম	প্রকাশকাল
শচীন সেন।	রবীন্দ্রকাব্য আধুনিক কেন ?	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

॥ রবীন্দ্র গল্প-উপন্যাস-আলোচনা ॥

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তিন সঙ্গী।	চৈত্র, ১৩৪৭।
সন্তোষকুমার প্রতিহার।	গোরা।	শ্রাবণ, ১৩৪৬।
হরপ্রসাদ মিত্র।	গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

॥ রবীন্দ্রজীবনী ॥

হারীতকৃষ্ণ দেব।	রবীন্দ্রনাথের চিঠি।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

॥ শান্তিনিকেতন—ইতিহাস ॥

জীবনময় রায়।	শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের স্মৃতি।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য

একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ, এম, টি, মহিন্দর / এসকর্টস / মিৎসুবিশি ট্রাকটরস।

খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।

গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।

ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস :

২৪-পরগণা (দক্ষিণ)	ঃ	১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
,, (উত্তর)	ঃ	২৭নং যশোর রোড. বারাসাত
হুগলী	ঃ	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, চুঁচুড়া/পুরশুরা
বর্ধমান	ঃ	৫নং রামলাল বোস লেন, রাধানগর পাড়া, ষ্টেশন রোড মেমারি, বর্ধমান
বাঁকুড়া	ঃ	লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	ঃ	সুভাষনগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	ঃ	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম	ঃ	সিউড়ি, বড়বাগান
মালদা	ঃ	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	ঃ	১৬, শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	ঃ	'সবরি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	ঃ	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
কুচবিহার	ঃ	এন, এন, রোড, কোচবিহার
পুরুলিয়া	ঃ	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড. পুরুলিয়া
নদীয়া	ঃ	১/১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ১৫নং আর এন. টেগর রোড, নদীয়া
উত্তর দিনাজপুর	ঃ	সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স
পশ্চিম দিনাজপুর	ঃ	বালুরঘাট

কতিপয় ক্যাম্প-গ্রন্থ

পাতালে টেনেছে আজ ১৫৲

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ ১২৫৲

সুকুমারী ভট্টাচার্য

মাও সেতুং-এর কবিতা ২০৲

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

ওপেনটি বাইস্কোপ ৪০৲

শোভন সোম

জাগো নভেম্বর ২৫৲

নন্দিতা চৌধুরী

ওকতেভিও পাজ্-এর কবিতা ২৫৲

অনুবাদ : অশোক রাহা

ক্যাম্প ১৫ ডিহি ইণ্টালী রোড, কল-১৪

পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭৩

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—

—র

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা

হীরেন্দ্রনাথের অসাধারণ মেধা-মনন, যাবতীয় সাহিত্য কীর্তি, তত্ত্ব প্রয়োগ, প্রগতি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণ ইত্যাদি নানা প্রান্ত নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন যথাক্রমে শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, বাসব সরকার, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, গৌতম নিয়োগী, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, ল্যাডলিমোহন রায়চৌধুরী, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, প্রদীপ্ত সেন, বাসব দাশগুপ্ত, হিমাচল চক্রবর্তী, মইনুল হাসান, সৌমিত্র লাহিড়ী, সুস্নাত দাশ, অঞ্জন বেরা, শুভময় মণ্ডল প্রমুখ। ব্যক্তিগত গদ্য লিখছেন ভবতোষ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় অজিতনাথ রায়, ডঃ অশোক মিত্র, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, মুলকরাজ আনন্দ, প্রণতি দে, সাধন গুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া আচার্য, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, আজিজুল হক, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এছাড়া থাকছে পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী এবং হীরেন্দ্রনাথকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের চিঠিপত্র।

প্রাপ্তিস্থান [] পাতিরাম, বুকমার্ক, মনীষা এবং এন. বি. এ.।

আনুমানিক মূল্য [] ২০ টাকা।

পরিচয়-এর গ্রাহক হোন

নবপর্যায়ে পরিচয় মুক্তিবুদ্ধি যুক্তিবাদী পাঠকের প্রত্যাশা

পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ

গ্রাহক সংক্রান্ত—

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে নিলে অতিরিক্ত দশ টাকা।

আপাততঃ পরিচয় প্রতি দুই মাসে যুক্ত সংখ্যা হিসেবে বেরুবে। দাম দশ টাকা। বিশেষ সংখ্যা বা শারদীয় সংখ্যার দাম পনের থেকে ত্রিশ টাকার মধ্যে থাকে, গ্রাহকগণ নির্ধারিত চাঁদার মধ্যে সব সংখ্যা পাবেন।

এজেন্সী সংক্রান্ত—

কমপক্ষে আট কপি নিতে হবে।

কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা।

পত্রিকা ভি-পি-তে পাঠানো হয়।

এজেন্ট নিজে সংগ্রহ করলে ছাড় ৩০'৩৩ শতাংশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহক কিম্বা এজেন্সী সংক্রান্ত চিঠিসব / রেজিস্টার্ড চিঠি / মনি অর্ডার / ড্রাফট / চেক ইত্যাদি অবশ্যই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে ঃ

পরিচয়

৩০/৬, ঝাউতলা রোড

কলিকাতা-৭০০০১৭

PARICHAY April 1995 Reg. No. 13273
WB/EC—265

পরবর্তী সংখ্যা

গান্ধী

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৯০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম পনেরো টাকা